বিতর্কিত বিষয়ে বাতেনি বাতচিত • ড. সফিকুল ইসলাম

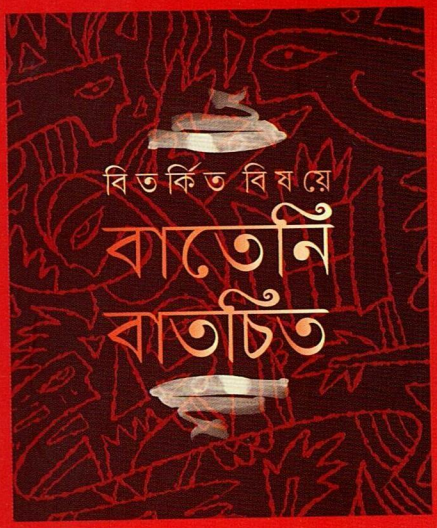

পক্ষ নেওয়া যদি লক্ষ্য হয়, তবে সত্যের সাথে সখ্য হয় না, চিন্তা-ভাবনা তীক্ষ্ণ হয় না। যে কোনো বিষয় বা ঘটনায় নিরপেক্ষ, নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবনা করতে পারা নাগরিকদের জন্য জরুরি। অন্যথায় মানুষ চিন্তার স্বজনপ্রীতি নামক ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকে। নাগরিকদের কাছে সত্য ও সহজ ধরা দেয় না। আমাদের দৈনন্দিন, সামাজিক, ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যুতে নানামুখী মতামত বা উপসংহার পাওয়া যায়। বেশির ভাগই একতরফা লেন্স থেকে দেখে। এরকম আলোচিত ও বিতর্কিত বিভিন্ন ইস্যুকে দশদিক থেকে দেখে ৩৬০ ডিগ্রি চিন্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এ বইয়ে। বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো পাঠকদের চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বিতর্কিত বিষয়ে বাতেনি বাতচিত
ড. সফিকুল ইসলাম
প্রকাশক
সৃজন
www.srijonbd.com
srijoneditor@gmail.com
+৮৮০ ১৯১৪ ৬৯৬৬৫৮
বাড়ি : ১২৬, রোড : ১, এভিনিউ : ৩
মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬
স্বত্ব © ড. সফিকুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪৩১, ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রচ্ছদ : আল নোমান
মুদ্রণ : এস আর এল প্রিন্টিং প্রেস, ২৫/এফ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
মূল্য : ৩৫০ টাকাং

Bitorkito Bisoyer Bateni Baatcheet
by Dr. Shofiqul Islam
Price : BDT 350.00 USD 25.00
ISBN : 978-984-99868-0-5

উৎসর্গ

জগতের সকল শোষিত, যারা শোষকদের ভয়ে মুখ
খুলতে পারেনি
স্রোতে ভাসা অসচেতন দল, যারা স্বার্থান্বেষীদের খেলায়
ভিন্ন চিন্তা ভাবতে পারেনি
আর জগতের সকল নিশ্চুপ মানুষ, যারা ভয়ে বাকরুদ্ধ
হয়ে চিন্তার দলা ঢোঁক গিলে ফেলেছে।

সূচিপত্র

দেশপ্রেম ও ক্ষমতা : সেকাল-একালে তফাত কী?	১১
কৃষিবান্ধব বাজেট : দুধের সর কোন বিড়ালে খায়?	১৬
ব্যক্তিপূজা, নাকি প্রতিষ্ঠানের পূজা?	২০
সরকারি কর্মচারীরা কি জনগণের চাকর নয়?	২৫
সমাজ পরিবর্তন: আশীর্বাদ, নাকি অভিশাপ?	২৮
সমকালীন কবিতায় গণমানুষের কণ্ঠ থাকে কি?	৩৩
দেশপ্রেম বলতে কি কিছু আছে?	৪০
পোশাক বা বোরখা বিতর্ক : কতটা সমীচীন?	৪৬
পাহাড়ি-বাঙালি বিবাদে বিবেচ্য বিষয়াদি কী?	৫৭
মাজার রক্ষা না মাজার ভাঙা–কোনটা যৌক্তিক?	৬৫
শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রগতিশীলতা ও উদারতা কই?	৭৯
পরিচ্ছন্ন নগরী তৈরি কার দায়? সরকার না নাগরিকের	৮৪
অগ্নিকাণ্ড : কায়দা করে দায় এড়িয়ে ফায়দা কী	৯০
করোনা পরিস্থিতি : মাঠ প্রশাসন কী করেছে?	৯৪
সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের নিজের অবস্থান কী?	৯৮
গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা ও বাস্তবতায় ফারাক কেমন?	১০১
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কোটা এলিটদের দখলে কি?	১০৭
বুয়েট-মেডিকেল-কৃষিতে পড়ে কি সাধারণ বিসিএসে আসা উচিত?	১১০
কেন 'স্যার' ডাকবেন, কেন ডাকবেন না?	১১৪
এনজিওর স্বরূপ কেমন?	১১৯
জেন্ডারবৈষম্য বলতে কিছু আছে কি?	১২৩
তালাকে সামাজিক সঙ্কট, কে দায়ী? নারী না পুরুষ	১৩২

ড. সফিকুল ইসলাম একজন বহুমাত্রিক লেখক ও গবেষক। তাঁর গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার বাদৈর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ ও এমবিএ, জাপান সরকারের জেডিএস স্কলারশিপ নিয়ে কোবে ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এবং অস্ট্রেলিয়ান সরকারের ফুলব্রাইট স্কলারশীপ নিয়ে গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করেন। পেশায় তিনি সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। গ্রাম ও শহরে বসবাস, দেশ ও বিদেশে অধ্যয়ন, ও বিসিএস প্রশাসনে জেলা উপজেলার মাঠপর্যায়ে গণমানুষের সংস্পর্শ আর কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের পলিসি পর্যায়ে কাজের সুবাদে লেখক পেয়েছেন মানুষ ও প্রকৃতির নানান রসদ ও অনুষঙ্গ; যা তাঁর লেখালেখিকে সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ—

কাব্যগ্রন্থ : যে কথা যায় না বলা (২০২২, আগামী প্রকাশনী), চিন্তানুরণন (২০২৩, মাত্রাপ্রকাশ), দ্বান্দ্বিক সময়ের কম্পিত স্বর (২০২৪, মাত্রাপ্রকাশ)

গল্পগ্রন্থ : লুকোচুরির জীবন (২০২৩, সৃজন প্রকাশনী)

এছাড়াও জাতীয় পত্রিকায় নানান সময়ে তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

যোগাযোগ: shafiq.bcs@gmail.com
www.drshafiqul.com

বিতর্কিত বিষয়ে বাতেনি বাতচিত

বিতর্কিত বিষয়ে বাতেনি বাতচিত

ড. সফিকুল ইসলাম
রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষক

সৃজন

বিতর্কিত বিষয়ে বাতেনি বাতচিত
ড. সফিকুল ইসলাম

প্রকাশক

www.srijonbd.com
srijoneditor@gmail.com
+৮৮০ ১৯১৪ ৬৯৬৬৫৮
বাড়ি : ১২৬, রোড : ১ এভিনিউ : ৩
মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬

স্বত্ব © ড. সফিকুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪৩১, ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রচ্ছদ : দেওয়ান আতিকুর রহমান
মুদ্রণ : এস আর এল প্রিন্টিং প্রেস, ২৫/এফ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
মূল্য : ০০০ টাকাং

Bitorkito Bisoyer Bateni Baatcheet
by Dr. Shofiqul Islam
Price : BDT 000.00 USD 00.00
ISBN : 978-984-99868-0-5

উ ৎ স র্গ

জগতের সকল শোষিত, যারা শোষকদের ভয়ে মুখ
খুলতে পারেনি
স্রোতে ভাসা অসচেতন দল, যারা স্বার্থান্বেষীদের খেলায়
ভিন্ন চিন্তা ভাবতে পারেনি
সকল কোণোব্যাঙ ধরণের মানুষ, যারা পৃথিবীকে হাজার
দিক থেকে দেখার সুযোগ পায়নি
আর জগতের সকল নিশ্চুপ মানুষ, যারা ভয়ে বাকরুদ্ধ
হয়ে চিন্তার দলা ঢোক গিলে ফেলেছে।

ভূমিকা

কোনো একটা ঘটনা ঘটলে বা কোনো একটা ইস্যু সামনে আসলে মানুষ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। ঘরে বাইরে, মাঠে-ঘাটে, ফরমাল-ইনফরমাল আলোচনায়, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিভক্ত হতে থাকে। অনেক বড় বড় সংবেদনশীল মানুষকেও এরকম স্রোতে ভাসতে দেখি। গরুর লেজ উল্টে দেখে না, গরুটি মর্দা না মাদি। সামাজিক ও অফিশিয়াল আড্ডাতেও একই অবস্থা বিরাজমান। মতামত আমাদের থাকবেই। কিন্তু সেই মতটাকে আরেকটু শাণিত করতে চেষ্টা করলে দোষ কী? আমাদের সে সময় নেই। আমরা সব সময় তাড়াহুড়া করি। সৃষ্টিকর্তা বলেছেন, "বান্দা, তোমাদের সবকিছুতেই বড় তাড়াহুড়া।" এই দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া থেকে আমাদের বিরত হওয়া প্রয়োজন।

যেকোনো ঘটনা বা বিষয়কে নানান দিক থেকে ভাবা যায়, বিশ্লেষণ করা যায়–এ বিষয়টা বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে কম দেখা যায়। যেকোনো বিষয়ে হুট করে উপসংহার টানা, তা বিশ্বাস করা আর তাতে স্থির থাকার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশি। অথচ একই ঘটনা বা বিষয় স্থান-কাল-পাত্র-পরিস্থিতি বিবেচনায় ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, মানুষ ও প্রকৃতির নানান ইস্যুতে আমরা মুহূর্তের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাই, আর একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করি। এমনকি কোথাও কোথাও খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়। অথচ অন্যের কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনলে, অন্যের লেন্স দিয়ে বিষয়টা একটু দেখলে, অন্যের অবস্থান থেকে একটু চিন্তা করলে হয়তো আমার ভাবনাটা একটু ভিন্ন হতো। হয়তো একটা পরিপক্ব চিন্তা ও উপসংহারে পৌঁছাতে পারতাম।

আমার বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনের কারণে এবং ব্যাপক পড়াশোনার কারণে সব সময় যেকোনো বিষয়কে শত লেন্স দিয়ে বিবেচনা

করার চেষ্টা করি। তাতে করে একটি সম্যক ধারণা পাই। সম্যক ধারণা রাখেন, এমন মানুষ সমাজে কম। যাঁরা আছেন, তাঁদেরকে আবার সমাজ শুনতে চায় না, পড়তে চায় না, মানতে চায় না। আবার যারা সম্যক বোঝেন, তাঁদের অনেকেই সকল বিষয়ে সব সময় লিখে প্রকাশ করতে চান না। যে কারণে সমাজের অনেকেই বহুমাত্রিক ভাবনা ও বহুমুখি মূল্যায়নে অভ্যস্থ হতে পারেন না। গণমানুষ এ রকম বইপত্রও খুব একটা পান না। যেসব বই আছে, তা খুবই তাত্ত্বিক ও সাবলীলভাবে রচিত না। সে চিন্তা থেকেই আমাদের সমাজে অহরহ ঘটা ও আলোচিত হওয়া নানান বিষয় নিয়ে এ বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

বইটির বেশির ভাগ রচনাই আমার নিজের উদ্যোগে লেখা। যখন কোনো ঘটনা ঘটেছে, তা ভেবে ভেবে চিন্তার নানান স্তরে পৌঁছে উপলব্ধি গভীর হলে তারপর লেখা অক্ষরগুলো পিসিতে তোলা। এভাবেই মনের নির্যাস এসেছে। বিষয় নির্বাচনে গণমানুষের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ও হট্টগোলই আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। সে ধাক্কা আমার মনোজগৎ ও চিন্তাজগতে অনুরণন তুলেছে। সমাজে বিবদমান গণমানুষের কিছু সমস্যা বিষয়ে ধারণা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করতে আর বিতর্কিত বিষয়গুলোকে নানান দিক থেকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আলোড়িত করার চেষ্টা করেছি। যেকোনো বিষয়কে হাজার দিক থেকে বিশ্লেষণের আলোড়ন তুলতে পারলেই একসময় থিতু হয়ে আমরা আলোকিত হওয়ার পথে ধাবিত হতে পারি।

কোনো কোনো লেখা দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, ডেইলি স্টার বাংলাতে মতামত বিভাগে কলাম হিসেবে ছাপা হয়েছে। তিনটি দৈনিকের সম্পাদক ও সহসম্পাদকদের ধন্যবাদ যে অপরিচিত মানুষের লেখা কেবল লেখার মানের উপর বিচার করে ছাপিয়েছেন। আমি কিছুটা অবাকই হয়েছি। আমার ধারণা ছিল, অপরিচিতদের লেখা রেফারেন্স ছাড়া ছাপাবে না! তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আবার কিছু লেখা জনাব জুননু রাইন ও জনাব ইমরান মাহফুজ বিষয় নির্বাচন করে চেয়ে নিয়েছেন। তাঁদের তাড়না ও উৎসাহ আমাকে কিছু লেখা লিখতে উৎসাহিত করেছে। এ জন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

সূচিপত্র

দেশপ্রেম ও ক্ষমতা : সেকাল-একালে তফাত কী?	১১
কৃষিবান্ধব বাজেট : দুধের সর কোন বিড়ালে খায়?	১৬
ব্যক্তিপূজা, নাকি প্রতিষ্ঠানের পূজা করবেন?	২০
সরকারি কর্মচারীরা কি জনগণের চাকর নয়?	২৫
সমাজ পরিবর্তন: আশীর্বাদ, নাকি অভিশাপ?	২৮
সমকালীন কবিতায় গণমানুষের কণ্ঠ থাকে কি?	৩৩
দেশপ্রেম বলতে কি কিছু আছে?	৪০
পোশাক বা বোরখা বিতর্ক : কতটা সমীচীন?	৪৬
পাহাড়ি-বাঙালি বিবাদে বিবেচ্য বিষয়াদি কী?	৫৭
মাজার রক্ষা না মাজার ভাঙা–কোনটা যৌক্তিক?	৬৫
শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রগতিশীলতা ও উদারতা কই?	৭৯
পরিচ্ছন্ন নগরী তৈরি কার দায়? সরকার না নাগরিকের	৮৪
অগ্নিকাণ্ড : কায়দা করে দায় এড়িয়ে ফায়দা কী	৯০
করোনা পরিস্থিতি : মাঠ প্রশাসন কী করেছে?	৯৪
সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের নিজের অবস্থান কী?	৯৮
গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা ও বাস্তবতায় ফারাক কেমন?	১০১
পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কোটা এলিটদের দখলে কি?	১০৭
বুয়েট-মেডিকেল-কৃষিতে পড়ে কি সাধারণ বিসিএসে আসা উচিত?	১১০
কেন ‘স্যার’ ডাকবেন, কেন ডাকবেন না?	১১৪
এনজিওর স্বরূপ কেমন?	১১৯
জেন্ডারবৈষম্য বলতে কিছু আছে কি? নাকি নিজেদের তৈরি?	১২৩
তালাকে সামাজিক সঙ্কট, কে দায়ী? নারী না পুরুষ	১৩২

দেশপ্রেম ও ক্ষমতা
সেকাল-একালে তফাত কী?

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের প্রেরণা, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অনেকগুলো প্রেক্ষাপট ছিল। যার কারণে আবালবৃদ্ধবনিতা, কিশোর, যুবক, শ্রমিক, কৃষক–সকলে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো, মুক্তিযোদ্ধা কারা আর রাজাকার কারা? একাডেমিক ও বাস্তব ইতিহাসের নিরিখে অনেকভাবে সংজ্ঞায়ন করা যাবে। তবে আমরা যদি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খেয়াল করি দেখব যে যেসব মানুষ দেশের মানুষের অধিকারের জন্য নিজের নিরাপত্তা না ভেবে, সকল স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তাঁরাই মুক্তিযোদ্ধা। অন্যদিকে নিজের পদ-পদবি, নিরাপত্তা, আর্থিক বা ক্ষমতার লোভের কারণে যারা পাকিস্তানিদের সাথে হাত মিলিয়েছিল, নিজের দেশ ও মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তারাই রাজাকার।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে এখন যদি আমরা আমাদের নিজেদের দিকে তাকাই বা আশপাশে অন্যদের দিকে খেয়াল করি, তাহলে দেখব যে এখনো এই দুই ধরনের লোক রয়েছে। একদল যারা নিজের সুবিধাকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে সময়, শ্রম, অর্থ উৎসর্গ করে। এরা যদি '৭১ সালেও জীবিত থাকত, তাহলে মুক্তিযোদ্ধাই হতো। অন্য দল রয়েছে যারা নিজের পদ-পদবি, নিরাপত্তা, আর্থিক বা ক্ষমতার লোভে দেশ ও মানুষের অকল্যাণ করে বা ক্ষতি সাধন করে। এ লোকগুলো যদি '৭১ সালে জীবিত থাকত, তাহলে এরাও রাজাকারই হতো। দ্বিতীয় গ্রুপের সংখ্যাই বেশি। নৈতিকতা, প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত মানুষ এবং সৃষ্টির প্রতি সংবেদনশীল মানুষের সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে।

এসব বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। অত্যাচারী শাসক, স্বার্থপর বণিকশ্রেণি ও শোষক পেশাজীবীদের রূপ ইতিহাসের কালভেদে পার্থক্য থাকলেও ভুক্তভোগীদের কাছে দানবরূপ একটাই। মনে করি, একজন লোক ১৯০০ সালে জন্ম নিয়ে ২০২০ সালে মারা যাবে। এর মধ্যে প্রতি দশকে সে বিভিন্ন নির্যাতন, অত্যাচার, অনাচার আর বৈষম্যের শিকার হলো। কখনো ব্রিটিশদের দ্বারা, কখনো স্বজাতি দ্বারা, কখনো পাকিদের দ্বারা, কখনো স্বধর্মের লোকদের দ্বারা, কখনো বিধর্মী দ্বারা, কখনো দূরের লোক দ্বারা, কখনো প্রতিবেশী দ্বারা, কখনো দেশি লোকদের দ্বারা, কখনো ডানপন্থী দ্বারা, কখনো বামপন্থী দ্বারা, কখনো মধ্যপন্থী দ্বারা। ভিকটিমের কাছে সব দশকের ক্ষমতাধর ওই সব লোক নমরুদ, ফেরাউন, আজরাইলের মতো ভয়ংকর, লর্ড ক্লাইভ বা আমেরিকার সেনাপ্রধানের মতো ধ্বংসাত্মক, আইয়ুব খান বা জেনারেল নিয়াজি বা রাজাকারদের মতো হিংস্র, খন্দকার মোশতাকের মতো বিশ্বাসঘাতক ও শঠ, স্বৈরাচারদের মতো নিষ্ঠুর। আসলে ভিকটিমের কাছে সব অত্যাচারীর রূপ এক। অত্যাচারীর চেহারামাত্রই ভিকটিমের কাছে যম। অত্যাচারী যে-ই হোক, আগের কিংবা পরের, সাদা কিংবা কালো, ডান কিংবা বাম, ধার্মিক কিংবা অধার্মিক। ভিকটিমের কাছে অত্যাচারীর চেহারা একটাই। স্থান, কাল, পরিপ্রেক্ষিতের কারণে পাত্রপাত্রী আলাদা হয় মাত্র।

এসব শোষণ ও অত্যাচারের জন্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বেছে নেয় গণমানুষের সেন্টিমেন্ট। কখনো ধর্ম, কখনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক ইস্যু, কখনো রাজনৈতিক আইডিওলজির বিভাজনের কৌশলগত বাজারজাত করে মানুষকে খেপিয়ে তুলে। এত কিছুর পরে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ যদি বাংলার কথাই ধরি। মোগল আমলে হিন্দু-মুসলিম এ দুভাগে বিভাজনের রাজনীতি ছিল। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের পাশাপাশি ইংরেজ বনাম স্বদেশি বিভাজন ছিল। হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে পুঁজি করে জিন্নাহ বা কংগ্রেস গং ভারত-পাকিস্তান করল। পাকিস্তানের সময়েও পূর্ব ও পশ্চিম বিভাজন ছিল। বৈষম্য ছিল। এ থেকে মুক্তি পেতেই বাংলাদেশের উদ্ভব। বাংলাদেশ হবার পরও মানুষ দুভাগে বিভক্ত। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আর বিপক্ষে। পাশাপাশি অতি ধার্মিক আর উদার ধার্মিক ইত্যাকার বিভাজন তো আছেই। এখন সর্বশেষ দেশ দুভাগে বিভক্ত ক্ষমতার লড়াইয়ে। স্বৈরাচারের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভাজন নব্বইয়ের দশকেও ছিল, এখনো বিরাজমান। মানুষের বিভাজন করা এবং একে পুঁজি করে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার যে খেলা,

সে খেলা শেষ হবার নয়। চলছে চলবে। আর মানুষও উইপোকার মতো আগুনে ঝাঁপ দেবে। কিন্তু 'তারপর তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো'—গল্পের মতো এমন করে আর বলা যায় না। আহা বাংলা! আহা মানুষ!

এসবের মাঝেও গণমানুষের নেতা কালে কালে আসে। মানুষের সত্যিকারের মুক্তির জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কিছু মানুষ কাজ করে। বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের কথা ভাবে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কথা আমরা জানি, দেশ বিভাগের সময়কার নায়কদের আমরা জানি, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও বীরদের খবরও আমরা জানি। ১৯৯০ থেকে ২০২৪-এর বীরত্বগাথাও আমাদের এখন মুখস্থ। "পৃথিবীর মজলুম মানুষ সব এক, তারা যেখানেই বাস করুক।" "ভোটের আগে ভাত চাই।" "আমি খেটে খাওয়া মানুষের কথা বলি।" "পৃথিবীর মানুষ দুইভাগে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।" "আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" "স্বৈরাচার নিপাত যাক।" এসব স্লোগান মানুষ গ্রহণ করেছে। এবং গণমানুষ যাকে সরানোর সরিয়েছে, যাকে গ্রহণের গ্রহণ করেছে। এ রকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা, চে গুয়েভেরাসহ পৃথিবীর বেশ কিছু আত্মত্যাগী নির্লোভ নেতা পাওয়া যাবে, যাঁরা সত্যিকার অর্থেই গণমানুষের স্বার্থে নিজের জীবন বাজি রেখে কাজ করে গেছেন। সফলও হয়েছেন। আলো জ্বেলে গিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর নিয়মই পরিবর্তন। মানুষও দিনে দিনে পরিবর্তিত হয়। যে বিশ্বাস, আশা, দেশপ্রেম ও মানবিকতার উপর ভিত্তি করে এসব সংগ্রাম সফল হয়, পরবর্তীকালে এসব আর থাকে না। পরের প্রজন্ম এসে হয় ভোগে মত্ত হয় কিংবা ক্ষমতার লড়াইয়ের খেলায় মেতে ওঠে। গড়ে তোলে নানান রকম জোট ও ক্ষমতার ভাগাভাগির খেলা। এসব খেলাতে কেউ নিরাপদ নয়। কে যে কখন ওঠে ও নামে, তা বলা মুশকিল। নিরাপত্তাহীনতা জেঁকে বসে শাসকদের মনে। যিশুখ্রিষ্টের সময়ের গল্প স্মর্তব্য। রোমান রাজা এক গভর্নরের এলাকায় বেড়াতে গেছেন। গভর্নরের স্ত্রী রাজকীয় ডিনার দিলেন রাতে। পরে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে রাজাকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যেতে বলেছেন। 'You are quite safe here. No worries.' রাজা বললেন: Emperors are safe nowhere, never. এত পুরোনো কথা, তবু কত নবরূপে সত্য এটি। তবু মানুষ রাজা হতে চায়!

আর তা ছাড়া ক্ষমতার জোট বা স্বার্থের কোয়ালিশন তো কখনোই স্থায়ী নয়। রোমান সভ্যতায় জুলিয়াস সিজার জোট করে পম্পে আর ক্রাসাসের সাথে। জুলিয়াস সিজার সিনেটের প্রধান, পম্পে সেনাবাহিনীর প্রধান আর ক্রাসাস ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রক। ক্ষমতার বলয়ে থাকার জন্য সিজার নিজের মেয়েকে বিয়ে দেয় পম্পের কাছে। সিনেটরদের পুতুল বানিয়ে সিজার নিজে পম্পের সেনাদের জমিদারি পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে, ক্রাসাসকে সব ব্যবসায়িক সুবিধা পাইয়ে দেয়। এসব করতে গিয়ে যত অন্যায় লাগে, তা-ও করেছে জুলিয়াস সিজার। কিন্তু বিধি বাম।

যারা দেয় তাদের সব দেওয়া হয়ে গেলেও যারা পায় তাদের পাওয়া শেষ হয় না। তাই বছর না যেতেই ক্রাসাস ও পম্পে মিলে সিজারকে সরাতে উঠে পরে লাগে। দুজনে মিলে সরিয়ে দেয় সিজারকে। প্রায় জোর করে তার অমতে কোনো একটি ছোট জেলার গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়ে দেয়। স্বার্থেরে জোট ভেঙ্গে যায়। সিজার খুব কষ্ট পায়। এ ধরনের ক্ষমতার জন্য ইঁদুর-বিড়াল খেলা অলিগোপলি জোট চলমান।

ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকে থাকতে, সিংহাসনের স্বাদ নিতে মানুষ রাজনৈতিক আইডিওলজি থেকেও সরে আসে, বিকিয়ে দেয় সকল নৈতিকতার মানদণ্ডও। ডিগবাজি খাওয়া রাজনীতিবিদদের নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন। ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে যাঁরা যান, তাঁরা কি আসলে শরীর নিয়ে যান, নাকি মনও নিয়ে যান। হুমায়ুন আজাদ তাঁর 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বইয়ে দেখিয়েছিলেন যে আইডিওলজিক্যালি পরিবর্তিত হলে মানুষ কতটা নষ্ট হতে পারে। তবে আমি সেটার সাথে সহমত হলেও বাস্তবে তা কমই ঘটে। বরং নিচের গল্পের মতো আমার মনে হয় দল পরিবর্তন করলেও নেতাদের মন, ভাবনা, চেতনা আগেরটাই থাকে। সাময়িক এ পরিবর্তন কেবল নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য। রাজনৈতিক অর্থনীতি। সবকিছুই রাজনীতি, রাজনীতিই সবকিছু। সবকিছুতেই রাজনৈতিক অর্থনীতি। তাহলে চলেন গল্পটা পড়ি। "সোনারগাঁওয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ মারা গেলে সিংহাসনে বসার মতো সবল উত্তরাধিকারী ছিল না। সে সময় সুলতানের হিন্দু মন্ত্রী রাজা গণেশ হিন্দু রাজত্ব ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেন। এ লক্ষ্যে সিংহাসন দখল করেন তিনি। প্রবল মুসলিমবিদ্বেষী গণেশ মুদ্রা জারি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক নানা ব্যবস্থাপনায় মুসলিম সংস্কৃতির উচ্ছেদ করতে থাকেন। এমন অবস্থায় পাণ্ডুয়ার

সুফি নূর কুতুব আলম বিহারের কাছে জৌনপুরের একমাত্র মুসলিম সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে বাংলার মুসলিম রাজ্য রক্ষার অনুরোধ জানান। আবেদনে সাড়া দিয়ে ইব্রাহীম শর্কী সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এ সংবাদে ভীত হয়ে পড়েন রাজা গণেশ। সামরিক শক্তিতে তিনি দুর্বল ছিলেন। তিনি তাঁর বারো বছরের ছেলে যদুকে নিয়ে সুফি কুতুবের দরবারে যান। বলেন, একজন মুসলমানের হাতে রাজক্ষমতা দিলে তো আপনার আর আপত্তি থাকবে না। আপনি তাহলে যদুকে মুসলমান বানিয়ে তার হাতে রাজদণ্ড তুলে দেন। এই যদুই হলেন পরবর্তী কালের বিখ্যাত সুলতান জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ। আসলে ক্ষমতার লোভে অথবা বিপদে পড়লে জাত-কুল-মান অনেকেই বিসর্জন দিতে পারেন। মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, গণেশের হিন্দু জাতীয়তাবাদ উত্থানের আদর্শিক চিন্তা একটি ভান ছিল মাত্র।

ক্ষমতার লড়াই, সিংহাসনের আসক্তি, অর্থ ও বিত্তলোভ কিছু মানুষের থাকবেই। তারা বিশ্ব বা দেশকে নিয়ন্ত্রণও করে। তবু পৃথিবী বা সভ্যতা এগিয়ে যায়। কারণ, গণমানুষের ভেতর অনেক কল্যাণকামী মানুষ নিভৃতে কাজ করে। সৃষ্টির কল্যাণে এবং দেশ ও মানুষের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। যত শঠতা ও নীচতাই থাকুক, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আলোকিত মানবের আগমন ঘটে। মোক্ষম সময়ে বারুদ জ্বলে, চারপাশ আলোকচ্ছটায় ভরে যায়। কারণ, প্রকৃতি একঘেয়েমি পছন্দ করে না, প্রকৃতি শূন্যতাও পছন্দ করে না। প্রেম ও ভালোবাসাই প্রকৃতির পছন্দ।

কৃষিবান্ধব বাজেট
দুধের সর কোন বিড়ালে খায়?

মহামারি করোনাভাইরাসের আক্রমণ বা বন্যা বা যেকোনো দুর্যোগের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি খেয়াল রাখার পাশাপাশি খাদ্যসংকট মোকাবিলায় সরকার কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের কৃষি খাতকে সব সময় বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৯ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা। এ ছাড়া প্রণোদনাও চালু থাকবে। সরকার কৃষককে সুবিধা দিতে নতুন অর্থবছরে উৎপাদন বাড়াতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৩ হাজার ১৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দ ধরলে এ প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য জিডিপির ২.৮৯ শতাংশ হিসেবে ১৬৪৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ২৫.৮৩ ভাগ বেশি। আর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ৩১৯৩ কোটি টাকা। যা বিগত বাজেটের তুলনায় ২৬.১৬ শতাংশ বেশি। বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে, "এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত।" আরও বলা হয়েছে, "করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই যেন খাদ্যসংকট না হয়। সে জন্য এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না।" সব মিলিয়ে কথার মধ্যে সরকারের ভিশন ও মিশন এবং প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ সুস্পষ্ট। বক্তৃতা, বিবৃতিতে এটা পরিষ্কার যে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে, রয়েছে বরাদ্দ প্রদানের বাস্তবমুখী উদাহরণ। সেভাবেই জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রয়েছে ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা ও পলিসি। এখন প্রশ্ন

হচ্ছে, যাদের জন্য এত আয়োজন, তাদের কাছে এ সুবিধা পৌঁছবে কি না? বাস্তবে কী কী বাধা কাজ করে মাঠেঘাটে।

কিছু চিত্র দেখি–

প্রথমত, সবাই নিজেরে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সবাই নিজের আখের গোছাতে থাকে, সবাই নিজের হিস্যা বুঝে নেয়। শুধু কৃষক নিজেরটুকু আদায় করতে পারে না। কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পায়, সে জন্য সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। যেমন প্রণোদনা দিচ্ছে, সারের দামে ভর্তুকি দিচ্ছে, সেচে ভর্তুকি দিচ্ছে, কৃষিঋণ দিচ্ছে, এমনকি কৃষিযন্ত্র ক্রয়েও শুল্ক মওকুফ করছে। দশ টাকা দামে কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করেছে, যাতে কৃষক সহজে ঋণ পায়। কিন্তু অনেক সময় প্রান্তিক কৃষকদের সিংহভাগ এ ঋণের সুযোগ পায় না। গ্রামের চতুর শ্রেণি নানা কারসাজির মাধ্যমে তা ভোগ করে। মাঝেমধ্যে কৃষিঋণ সম্পূর্ণ মওকুফ করে সরকার, ভর্তুকি দিয়ে সরকার ধান কেনে। এ রকম আরও অনেক উদ্যোগ ও চেষ্টা সরকারের রয়েছে। কিন্তু সারের ভর্তুকি সুবিধা থেকে কৃষকের আশপাশে বাস করা সার ব্যবসার সাথে জড়িতরা ফায়দা নেয়; সেচের ভর্তুকিতে কৃষকের পাড়াতো ভাই সেচ ব্যবসায়ীরা সুবিধা পায়; কৃষিঋণে কৃষকের তালাতো ভাইদের পেট মোটা হয়; ধান কেনার ভর্তুকিও এ রকম পরিচিত ভাইদের কারণেই হারিয়ে যায়, কৃষিযন্ত্র ক্রয়ের শুল্ক মওকুফও পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের বেশি মার্জিনের কারণে কৃষককে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়। সরকারের এত সব আন্তরিক প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত করে কিছু লোক। তারা কারা কেন, কী কী কারণে কীভাবে এসব করে, এ নিয়ে গবেষণা দরকার এবং করণীয় বের করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে অন্যান্য পণ্যের যে হারে দাম বেড়েছে, সে হারে কৃষিপণ্যের দাম বাড়েনি। শহরে বাড়লেও কৃষক পর্যায়ে সে দর পায় না। অস্ট্রেলিয়ায় চালের দাম ৮০০০ টাকা মণ। জাপানে চালের দাম তারও অনেক বেশি। ঢাকায় চালের দাম ২০০০ টাকা মণ। চাল আবার রপ্তানিও হয়। তবে যেসব দেশে রপ্তানি করলে বেশি দাম মিলবে, সেসব দেশে রপ্তানি হয় কি না। রপ্তানি যদি হবে বেশি মূল্যে, তবে কৃষক মূল্য পাবে না কেন? ধানের দাম গ্রামে ৫০০ টাকা মণ! খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকারি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, রাইস মিলওয়ালা, পথে পথে ফড়িয়া ব্যাপারীরা মাত্রাতিরিক্ত লাভ করে। ট্রাকওয়ালা বেশি ভাড়া নেয়, পথে পথে চাঁদা দিতে হয়, গুদামমালিক ভাড়া বেশি নেয়। তাদের এত লোভ কেন, তারা কেন কীভাবে কী কী করে, এ নিয়ে অনুসন্ধান দরকার।

তৃতীয়ত, কৃষকের ধানের দাম বাড়িয়ে দেওয়া সরকারের একক কাজ নয়। প্রধান দায়িত্ব সরকারের নিশ্চয়ই। সরকারের করণীয় সরকার করবে। সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি-পেশার মানুষকেও ভাবতে হবে। কৃষককে নিজেও ভাবতে হবে। কৃষকের আশপাশের নেতাকেও ভাবতে হবে রাস্তায় চাঁদা না নেওয়ার কথা। কৃষকের পাড়াতো ভাই পরিবহন নেতাকে ভাবতে হবে একটু কম লাভ করার কথা। কৃষকের খালাতো ভাই রাইস মিলমালিককে ভাবতে হবে একটু কম মুনাফা করার কথা। কৃষকের প্রতিবেশী ভাই খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীকে ভাবতে হবে একটু কম কমিশন নেওয়ার কথা। রপ্তানিকারককে ভাবতে হবে মার্জিন কম নেওয়ার কথা। কৃষকের দূরের আত্মীয় ভোক্তাদেরও ভাবতে হবে, সব দাম দিয়ে কিনতে পারলে চালও দাম দিয়ে কিনবে। সরকারের মাঠপর্যায়ের সংস্থাগুলো খেয়াল রাখতে হবে যেন সকল অংশীজন সঠিক আচরণ করে।

চতুর্থত, ধর্ম, তত্ত্ব, মতবাদ নিয়ে রাজনীতি হয়, সাদা-কালো নিয়ে রাজনীতি হয়, অঞ্চল নিয়ে রাজনীতি হয়, খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ নিয়ে রাজনীতি হয়, কিন্তু দেশের সিংহভাগ ভোটার কৃষকদের স্বার্থ নিয়ে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ নয়, প্রান্তিক কৃষকদের সমিতি নেই, দু-একটা থাকলেও শক্ত নয়। কৃষকেরা নিজেরা শক্ত না হলে বিত্তবানেরা তাঁদের সম্পদের তথা ধান-চালের প্রকৃত দাম দেবে না, এটাই বাস্তবতা। শক্তের ভক্ত নরমের যম–এ প্রবাদের মতোই বাস্তবতা। পেশা বা কাজভিত্তিক এ শ্রেণি বিভাজনের খেলায় প্রভাবশালী খেলোয়াড়েরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। এ কারণেই কৃষকদের হিস্যা পথে পথে ঘাটে ঘাটে ইঁদুরেরা খেয়ে ফেলে। কৃষকের জমির ফসল খায় জমির ইঁদুর, আর ভর্তুকি, ঋণ, প্রণোদনার ভাগ প্রায়ই খায় অন্য ইঁদুরেরা। এভাবেই কৃষকের উন্নয়নে কৃষকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে করা সরকারের পরিকল্পনা যথাযথ ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্যোগী ও সজাগ হতে হবে। উদ্যোগগুলো কার্যকর করার বিষয়ে এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে। যাতে করে সরকারের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হয় সঠিকভাবে, যাতে বরাদ্দগুলো যথাযথভাবে পৌঁছায় প্রকৃত কৃষকের হাতে। কোনো মধ্যস্বত্বভোগী যেন এসবের ভাগ না পায়। দুধের সরের মতো উপর থেকে সরটা যেন কেউ না খেয়ে ফেলে। করণীয় হতে পারে–

এক. সরাবরাহ চেইনগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দর করার মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে, মেকানিজম বের করতে হবে।

দুই. কৃষকদের মূলধন সংকট দূর করার জন্য কৃষিঋণ যেন প্রান্তিক কৃষকের হাতেই পৌঁছায় সে জন্য ডিজিটাল ব্যাংকিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে এবং প্রকৃত কৃষক বাছাইয়ে কমপ্রিহেনসিভ ও ইনক্লুসিভ মেকানিজম এবং ডিজিটালাইজড ফরম্যাট বের করতে হবে। তিন. সেচে, সারে ও কৃষিযন্ত্র আমদানিতে ভর্তুকির সুফল যেন প্রান্তিক কৃষকেরা পায়, সে জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দূর করতে কার্যকর পন্থা নিতে হবে।

করোনাকাল, বন্যা বা দুর্যোগকাল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে কৃষি, কৃষক ও ফসলের গুরুত্ব কত বেশি! সুতরাং এ খাতকে পুঁজিবাদের আগ্রাসী থাবা থেকে রক্ষা করতে হবে। কৃষিবান্ধব সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার সফল ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে সকল অংশীজনকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

(কলামটি দৈনিক *প্রথম আলোর* মতামত বিভাগে ২০২০ সালের ৩ জুলাই প্রকাশিত)

ব্যক্তিপূজা, নাকি প্রতিষ্ঠানের পূজা করবেন?

যেকোনো বিষয়কে আমরা হালকা করে ফেলি যাকে-তাকে সিম্বলাইজ করে। যেমন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমরা মিরজাফরকে সিম্বলাইজ করে ফেললাম। ভাবখানা এমন যে আর কেউ এ বাংলায় মিরজাফর নেই। যেমন আমরা দু-তিনজনকে ফ্যাস্টিস্ট বা স্বৈরাচার উপাধি দিয়ে দিলাম। উপাধি দিয়ে কেবল দু-তিনজনকেই ফ্যাসিস্ট বা স্বৈরাচার হিসেবে ঘৃণা-পূজা দিতে থাকলাম। ভাবখানা এমন যে আর কেউ কোনোকালে ফ্যাসিস্ট বা স্বৈরাচার ছিল না।

.

আবার ইতিবাচকতার দিক থেকেও আমরা দু-চারজনকে নায়ক বানাই, হিরো বানাই, জাতির কাণ্ডারি বানাই। পরে তাকে বা তাদের জাতির আইকন বা পথপ্রদর্শক হিসেবে উপাধি দিই। পূজা করি, করতে করতে একবারে সব ক্রেডিট বা স্তুতি তাকে দিয়ে দিই। ভাবখানা এমন যে এ বাংলার স্বাধীনতা আনয়নে বা গণতন্ত্র আনয়নে বা বাক্‌স্বাধীনতা আনয়নে বা মানবাধিকার রক্ষায় আর কারও কোনো ভূমিকা ছিল না।

অথচ হওয়া উচিত এমন যে যেসব কাজ ঘৃণার, সেসব কাজকে ঘৃণা করব, আর যেসব কাজ প্রশংসার, সেসব কাজকে প্রশংসা করব। যদি তা করা হয়, তবে গণমানুষ প্রশংসার কাজ নিয়ে মত্ত থাকবে ও ঘৃণ্য কাজকে বর্জন করবে।

এখন গণমানুষ ব্যক্তিপূজা ও ব্যক্তিঘৃণায় মজে আছে। ব্যক্তির বাইরে তাদের কাছে কোনো সিম্বল নেই, প্রতীক নেই। বুদ্ধিজীবী ও স্বার্থান্বেষী মহল ইচ্ছে করে রাজনৈতিক অর্থনীতির ফায়দা গ্রহণের জন্য এ ধরনের ব্যক্তিপূজা ও ব্যক্তিঘৃণা তৈরি করে। সত্যিকার বুদ্ধিজীবী ও আলোকিত মানুষদের উচিত উত্তম কাজের স্তুতি করা, উত্তম কাজকে ছড়িয়ে দেওয়া। গণমানুষ যেন কেবল উত্তম কাজে মত্ত থাকে, আর মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকে।

স্বৈরাচার নয়, স্বৈরাচারীপনা থেকে দূরে থাকুন

আইডল বা প্রতীক নয়, উত্তম কাজে মত্ত থাকুন।

আমরা যারা মনে করি স্বৈরাচার মানে অমুক বা তমুক কিংবা এই কয়জন বা ১০০ জন, এটা ভুল দিকে ধাবিত হয়। কারণ, এ লোকগুলোর বাইরে যে আরও হাজার স্বৈরাচার মানসিকতার লোকজন চারপাশে বিদ্যমান তারা তখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ, আমরা কেবল কতিপয় ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। তাই গণমানুষ ধরে নেয় যে ওই কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আর সকলে সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে। প্রকৃতপক্ষে জনতার জানা উচিত স্বৈরাচারের কাজগুলো কী, বৈশিষ্ট্যগুলো কী। সেগুলোকেই গণঘৃণার মুখোমুখি করতে হবে।

যেমন স্বৈরাচার মানে অন্যের মতামত সহ্য করতে না পারা, ভিন্নমতকে শুনতে না চাওয়া, ভিন্নমত যৌক্তিক হলেও তা গোঁয়ার্তুমি করে এড়িয়ে যাওয়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গণমানুষের পালস না বোঝা, এককভাবে বা কেন্দ্রীয়ভাবে কতিপয় মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, কতিপয় এলিটের অলিগার্ক করে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা, জনরোষ যত বেশিই হোক না কেন পাত্তা না দেওয়া, দেশীয় ও প্রতিবেশীদেরও দমনে ব্যবহার করা, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা, সকল বাহিনীকে ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা, জনমত বা সচেতন নাগরিকদের যৌক্তিক দাবিগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, যৌক্তিক আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহ বা সমাজদ্রোহ মনে করা, নানান লেভেলিং দিয়ে আইনের শাসনের পরিবর্তে দমন-পীড়নে আইন ও বিচারপ্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা।

তো এগুলো হলো স্বৈরাচারের কর্মকাণ্ড। এখন এ কাজগুলো যে করবে, সে-ই স্বৈরাচার হবে। যেহেতু আমরা কতিপয় ব্যক্তিকে স্বৈরাচার টার্ম দিয়ে ঘৃণা করি, সেহেতু সমাজের আরও যারা নতুন ক্ষমতায় আসে, তারাও স্বৈরাচার বনে যায়। আমরা যদি কতিপয় ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে, তাদের কাজগুলোকে আলাদা করতাম, ডিফাইন করতাম, চিহ্নিত করতাম ও ঘৃণা করতাম, তাহলে ওসব কাজ হলেই আমরা জনতা প্রতিবাদে ফেটে পড়তাম। আমরা তা করি না। আমরা কতিপয় ব্যক্তিকে স্বৈরাচার মনে করি এবং স্বৈরাচার পালালেই আমরা খুশি হয়ে নতুনদের ছাতার নিচে দাঁড়াই। নতুনজন যে আবারও সেসব স্বৈরাচারী কাজকর্ম শুরু করেছেন, তা আমরা চর্মচোখে দেখি না। দেখলেও সেটা আমাদের কাছে শক্তভাবে ধরা দেয় না।

যে কারণে '৭১-এ পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের দূর করে জনতার পছন্দের লোকদের আমরা দায়িত্ব দিই। পরে দেখা গেল সেখানেও আবার কতিপয়

মিলে উপরের স্বৈরাচারীর বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ শুরু করেছে। ৭৫-৮১তে যারা ছিল, তারাও কমবেশি এসব উত্থান-পতনে গিয়েছে। '৯১-৯০ আবার নতুন কজন স্বৈরাচার আমরা দেখলাম। '৯০-এ স্বৈরাচার হটিয়ে আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছি। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাব যে ১৯৯১-২০০৮ সময়ে যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা কোনো না কোনোভাবে স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্যমূলক কোনো না কোনো কাজ করেছে। আর ২০০৮-২০২৪ তো আমাদের সকলের দেখাজানা হলোই। এখন ২০২৪-এর পরে কী হচ্ছে বা হবে, তা-ও আমরা বুঝে যাব অনায়াসে।

প্রতিটি শাসনকাল ধরে ধরে যদি মোটাদাগের কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে আমরা দেখব যে বাংলার জনগণ এক স্বৈরাচার দূর করে আরেক স্বৈরাচার ঘরে তুলেছে। ধরন বা রকম হয়তো ভিন্ন, কিন্তু ফলাফল বা প্রভাব একই।

তাই আমার বক্তব্য হলো, ব্যক্তিপূজা ও ব্যক্তিঘৃণা বন্ধ করে, বরং তাদের কাজগুলোকে ঘৃণা বা প্রশংসা করতে হবে। তথা স্বৈরচারেরা যা যা করেছে তা তা যখন নতুন কেউ করা শুরু করে তখনই বিক্ষোভে ফেটে পড়তে হবে। মন্দ কাজ বা স্বৈরাচারি আচরণ বা দমনপীড়ণ মাত্রই স্বৈরাচারের কাজ, সেসব কখনোই হতে দেওয়া যাবে না।

বিজয়ীরা ইতিহাস লেখে। লেখার সময় বিজয়ীদের গুণগাথা লেখা হয়, আর পরাজিতদের নামে কিছু সত্যের পাশাপাশি অজস্র মিথ্যা বয়ান তৈরি হয়। পরাজিতরা প্রতিবাদ করতে পারে না। করলেও তা ধোপে টেকে না। '৭১-৭৫ পর্যন্ত আমরা একরকম বয়ান দেখেছি। '৭৫-৮০ আরেক রকম বয়ান পেয়েছি। '৮১-৯০ আবার অন্য রকম খেলা। ১৯৯১-২০০৮ ইতিহাসের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া। আর তারপরে ১৬ বছর আবার নতুন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের ইতিহাস আমরা পড়েছি, শুনেছি। ২০২৪-পরবর্তী খেলায় আবার আমরা নতুন বয়ানের পথে হাঁটছি।

পথ যতই হোক, সত্যের পথে হাঁটা আমাদের হলো না। যদিও কতিপয় আলোকিত মানুষ এসব বোঝেন, তবু গণমানুষকে নানানভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির খেলায় ফেলে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ এসব শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে গ্রহণ করতে না চাইলেও গ্রহণ হয়ে যায়।

নতুন প্রজন্ম অবশ্য আগের খবর দেখেনি, জানে না। তবে গত ২০ বছরের খেলা দেখেই বুঝতে পারে যে জানার ও বোঝার শেষ নেই। ইতিহাস লেখার কথা ইতিহাসবিদগণের এবং তা-ই জনতার পড়ার কথা। কিন্তু না। ইতিহাস

নির্মাণ করেন, বিনির্মাণ করেন, প্রচার করেন, বহাল করেন সব রাজনীতিবিদেরা। সুতরাং রাজনৈতিক পালাবদলে ইতিহাসের বিনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও প্রচার চলমান থাকে। সে কারণে ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হয়, আবার পুনরাবৃত্তিও হয়। সমস্যা হলো মানুষ সব মনে রাখে না বা রাখতে চায় না।

যখন আমরা কাউকে হিরো বানিয়ে অতিমাত্রায় পূজা করা শুরু করি। তখন কয়েকটি ঘটনা ঘটে। যাকে পূজা করা হচ্ছে, তার গুণগুলোকে কেবল মুখে মুখে স্মরণ করা হয়, কাজে বাস্তবায়ন করা হয় না। বরং যাকে সিম্বলাইজ করে পূজা করে যাচ্ছি, তার নাম বিক্রি করে যত অনিয়ম ও কুকর্ম আছে, তা করে যাই। তার নামে নানান প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা বানাই, তার নামে সরকারি অর্থের অপচয় করি, তার নামে স্লোগান দিই আর খাসজমি দখল করি, ফুটপাত দখল করি, পদ দখল করি, পদোন্নতি বাগিয়ে নিই। তার নামের গুণ গাই আবার হলের সিট দখল করি, ধর্ষণ বা ইভ টিজিং করি, চাঁদাবাজি করি। তথা তার নামে স্তুতি করার মূল ফোকাস হচ্ছে নিজের আখের গোছানো। আর যেহেতু গায়ে সিম্বলের পোশাক আছে, মুখে সিম্বলের স্তুতি আছে, সেহেতু যত আকামই হোক না কেন, সেখানে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিচার সংস্থা স্বাধীনভাবে কোনো ভূমিকা রাখতে আড়ষ্ট হয়। সংগত কারণেই ব্যক্তিপূজা দেশের কোনো কল্যাণে আসে না।

যখন কাউকে আমরা ঘৃণার সিম্বল বানাই তখনো জনমনে এ ধারণা প্রোথিত হয় যে, ওই লোকগুলোই মন্দ আর কারও সমস্যা নেই। তারপর দেশ যার হাতেই যাক দেশ সুন্দরভাবে চলবে। বাস্তবে তা চলে না। এখন নতুন যারা ক্ষমতায় আসে, তারা রাজ্যের অনিয়ম করলেও কোনো গণমানুষ সহজে চেপে ধরে না। তারা ভাবে, মন্দ লোক তো সব দেশ ছেড়েছে বা জেলে পুরে রাখা হয়েছে। এখন যারা ক্ষমতায়, তারা এ রকম মন্দ কাজ আর করতে পারে না। এভাবেই মন্দ কাজ আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, প্রতিষ্ঠান, সিস্টেম আবারও দাঁড়ায় না। সব কয়েকজনের ইশারায় হয়। এতে করে নতুন করে আবার স্বৈরাচারী কাজকর্ম বাড়ে, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন বাড়ে, নিয়ম ভাঙার খেলায় জনে জনে মেতে উঠে। নতুন অলিগোপলি ক্ষমতার বলয় তৈরি হয়।

যদি ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তিঘৃণা না হতো, তবে দুটি ঘটনা ঘটত। প্রথমত, মানুষ উত্তম কাজের প্রশংসা করত ও উত্তম কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করতো। আর মন্দ কাজ বর্জন করতো, মন্দ কাজে মানুষকে বিরত রাখত।

দ্বিতীয়ত, দেশের প্রতিটি কাজে, সংগঠনে ও দপ্তরে সিস্টেম বা পদ্ধতি দাঁড়

করাতো। সকল উত্তম বেঞ্চমার্ক গ্রহণ করে, সকল মন্দ উদাহরণ বাতিল করে যদি প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড় করানো যায়, তবে লোক কে আসল গেল বিষয় না। প্রতিষ্ঠান শক্ত মেরুদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, এতে সিস্টেম, পদ্ধতি, নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করা হবে।

বাংলাদেশের জনগণের উচিত এ ধরণের ব্যক্তিপূজা, ব্যক্তিঘৃণা বন্ধ করে, উত্তম কাজের লিস্ট করে অনুসরণ করতে ধাবিত হওয়া, আর মন্দ কাজের লিস্ট করে করে তা বর্জন করার দিকে ধাবিত হওয়া। এতে করে নতুন করে কেউ এসে আর হিরো সাজতে আসবে না, জাতির ত্রাণকর্তা সাজতে আসবে না। আবার ত্রাণকর্তা হওয়ার পরে স্বৈরাচারে রূপান্তরও হতে পারবে না। গণমানুষের উচিত বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি, সিস্টেম ও নিয়মকে বহাল করা, পূজা করা ও মান্য করা। তাহলে ব্যক্তি-নেতারা চলে গেলেও দেশ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সহজভাবে, সুন্দর ও সাবলীলভাবে চলতে পারবে। প্রতিষ্ঠান, পদ্ধতি, সিস্টেম দাঁড়িয়ে থাকবে। জনতা বা নেতার একাংশ দায়িত্ব পালন করতে আসবে, সেবা দেবে ও চলে যাবে। এতে করে দেশের বা সমাজের বা প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, ব্যক্তিপূজা ও ব্যক্তিঘৃণা চলমান থাকলে ব্যক্তি যত দিন থাকবে ত তদিন প্রতিষ্ঠান বা সমাজ বা সরকার একভাবে চলে, ব্যক্তি চলে গেলে প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে পড়ে বা ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তিঘৃণা নয়, প্রতিষ্ঠান-পদ্ধতি ও সিস্টেমের পূজাই দেশকে এগিয়ে নিতে পারে।

ব্যক্তিপূজা বন্ধ হলে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব গঠন ও বাছাইপ্রক্রিয়া সুসংহত হবে, ব্যক্তিপূজা বন্ধ হলে আমলাতন্ত্রের ভেতরে সিস্টেম ও পদ্ধতি কাজ করবে, কাজ না করে কেবল কথার পণ্ডিতি আর দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে পদোন্নতি ও পদায়ন বন্ধ হবে, রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তখন সহজ ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। এসব দল, সমাজ, সরকার, প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তি আসল বা গেল তাতে কিছু যাবে আসবে না। প্রতিষ্ঠান তার নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হবে।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠান-পদ্ধতি-সিস্টেমেই দেশ চলে, আমাদের মতো ব্যক্তিনির্ভর সমাজ বা প্রতিষ্ঠান তৈরি ও ধ্বংস হয় না। সুতরাং ব্যক্তিপূজা বা ব্যক্তিঘৃণা নয়, প্রতিষ্ঠান-সিস্টেম-পদ্ধতি-নিয়মকানুনের পূজাই দেশকে ও দেশের মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

সরকারি কর্মচারীরা কি জনগণের চাকর নয়?

এ প্রশ্ন মনে আসার সাথে সাথে একই রূপে আমাদের মনে প্রশ্ন আসা উচিত, ব্যাংক কর্মকর্তা কি ব্যাংকমালিকের চাকর নয়? ইউনিলিভারের কর্মকর্তা কি ইউনিলিভারের মালিকের চাকর নয়? এনজিও কর্মকর্তা কি এনজিওর মালিকের চাকর নয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকের চাকর নয়? গুগল কর্মকর্তা কি গুগল মালিকের চাকর নয়? যদি এসব প্রশ্ন মনে না আসে, তবে সরকারি কর্মকর্তার জন্য এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসবে কেন? যদি কেউ এসব ক্ষেত্রে চাকর বলার চেষ্টা না করি, তবে সরকারি কর্মকর্তাকে কেন করব?

২. অনেকেই বলেন জনগণের চাকর; কারণ, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তাঁদের বেতন হয়। জনগণের টাকায় বেতন হয়, ভালো কথা। আপনার টাকায় কি বেতন হয়? জনগণ বলতে বাস্তবে কোন মানুষ কি আছে? জনগণ চাকর ডাকুক। আপনি চাকর ডাকতে যাবেন কেন? 'জনগণ' শব্দ বেইচা সারা পৃথিবী খাচ্ছে, আপনিও খেতে চান? আপনি তো আর জনগণ না। আচ্ছা ধরে নিই আপনিও জনগণ। আপনি যদি জনগণ হন, তাহলে সরকারি কর্মকর্তা নিজেও জনগণ। তাহলে জনগণের ট্যাক্সে বেতন হয় মানে হলো সরকারি কর্মকর্তার বেতন তার নিজের ট্যাক্সের টাকায় হয়, তার আত্মীয়স্বজনের ট্যাক্সের টাকায় হয়। কারণ, তারাও জনগণ। তাহলে আপনি কোথাকার কে হে? যে ১৬ কোটি ভাগের এক ভাগ ট্যাক্স দেন, যা আবার দেশের হাজার কোটি খাতে ব্যয় হয়; সেই হাজার হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ ট্যাক্স দিয়ে সমগ্র সরকারি কর্মকর্তাকে চাকর বলার হিম্মত দেখান। দেশের লাখ লাখ সরকারি কর্মকর্তাও আপনার মতোই ট্যাক্স দেন। তাঁদের ট্যাক্সের টাকায়ও হাসপাতাল চলে, রাস্তা হয়, এটা হয়, সেটা হয়, যা আপনি ব্যবহার করেন। তাহলে কি আপনাকে সরকারি কর্মকর্তারা চাকর ডাকবে?

৩. হ্যাঁ, যদি কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা আপনাকে সেবা না দিয়ে থাকেন,

ভালো আচরণ না করে থাকেন, হয়রানি করে থাকেন; তবে আপনি তাঁকে অদক্ষ বলতে পারেন, হয়রানি করেছেন বলতে পারেন, অন্যায়কারী বলতে পারেন, কর্তব্যে অবহেলা করেছে বলতে পারেন। প্রয়োজনে আপনি মামলা করতে পারেন। কিন্তু কোনোভাবেই চাকর বলার কোনো এখতিয়ার আপনার নেই। সংবিধান আপনাকে সে অধিকার দেয়নি।

৪. পাবলিক সার্ভিসের বাংলা জনসেবা। সুতরাং যাঁরা পাবলিক সার্ভিসে কাজ করেন, তাঁরা জনসেবায় নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। আপনার কর্মচারী নয়। সরকারের কর্মচারীও নয়। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। সংবিধান সে কথাই বলেছে। দেখুন সংবিধানের ২)২১) "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" প্রজাতন্ত্র তাঁকে নিয়োগ দিয়েছে। বেতনের বিনিময়ে তাঁরা সেবা দেবেন। সেবা দেওয়া তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুতরাং আপনি সরকারের হোন বা বাইরের হোন, প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীদের কোনোভাবেই চাকর বলতে পারবেন না। যদি তাঁরা দায়িত্ব পালন না করেন, তাঁকে ভুলগুলো বলে সমালোচনা করতে পারেন, অভিযোগ করতে পারেন, মামলা করতে পারেন। কিন্তু চাকর বলার কোনো এখতিয়ার বা অধিকার কোনোটাই আপনার নেই।

৫. আপনি যে পেশাতেই আছেন, আপনি কি নিজেকে আপনার চাকুরিদাতার বা চাকুরিরত প্রতিষ্ঠানের চাকর বলে মনে করেন? মনে হয় করেন, তাই প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেলায় আপনার মনে চাকর শব্দটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

৬. চাকর শব্দটাই আপত্তিকর। মার্ক্সের এর ক্লাস স্ট্রাগল থেকে উদ্ভূত। এটা বলার মধ্য দিয়ে আপনি নিজেক উপরের তলায় তোলার উপায় খোঁজেন। আপনার মনোজগৎ পুঁজিবাদ আর কলোনিয়ালিজমের জালে আটকা পড়ে আছে। সেই জাল থেকে নিজেরে বের করেন। খোলস থেকে বের হয়ে কথা বলেন।

৭. সংবিধানে বলা আছে, 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।' ৭(১)-এ এটাও বলা আছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" সুতরাং যথাযথ পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী নিয়োজিত হয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তারাই এখতিয়ারপূর্ণ। সেখানে ভুল হলে আইনানুগ যেকোন সমালোচনা ও অভিযোগ আনতে পারেন। কিন্তু চাকর শব্দের উৎপত্তি সংবিধানে নেই। পুরোপুরি আপনার মনোজগৎ থেকে উৎসারিত।

৮. তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই কিছু সরকারি কর্মচারীর আচরণে নাক উঁচু ভাব আছে। যার কারণে বাইরের কিছু লোক এটার সমালোচনা করে ও বলে যে সরকারি কর্মচারীরা 'জনগণের চাকর'। 'জনগণের চাকর' কথাটা বলার সময় ওই সব সিভিল গংদের ঘাড়ের রগ ফুলে ওঠে, নাকমুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আসে, বলার স্বরে একটা ঝাঁজ থাকে, মনের ঈর্ষাটা উঁকি মারে, এই বলাটা ওই নাক উঁচু আমলাদের আচরণের চাইতে আরও বেশি কলোনিয়াল, আরও বেশি হিংসাত্মক, আরও বেশি ধ্বংসাত্মক, আরও বেশি হীনম্মন্যতার, আরও বেশি ঘৃণ্য।

সিভিল সার্ভিসে কাজ করা মানে সিভিল সার্ভেন্ট না। চাকরি আর চাকরের যে সম্পর্ক বলছেন, সেটা তো সব চাকরির বেলায়। শুধু সরকারি কর্মচারীদের জন্য হবে কেন? সুতরাং এখানে শব্দ বিষয় না, বিষয় হলো বলার ধরন, প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য।

মোদ্দাকথা হলো, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদেরও দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। প্রত্যেকেরই তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত। যদি কেউ না করে, তবে তাঁর গঠনমূলক সমালোচনা হতে পারে। কিন্তু কোনো অযাচিত সীমালঙ্ঘন নয়।

প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মকর্তা হিসেবে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেকে সব সময়ই একজন সেবক মনে করা উচিত, সেবা দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। সহজে সেবা দিতে হবে ও নাগরিকদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে শোনা ও কাজ করে দিতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে বিভাগীয় মামলাসহ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থার আওতায় আসা উচিত। কতিপয় বেপরোয়া হামবড়া ভাবের সরকারি কর্মচারীকে শাস্তি দিলেই বাকি সিভিল সার্ভিসের সকলেই সিভিল হয়ে যাবে। তার জন্য চাকর বলে গালাগালির দরকার নেই।

সমাজ পরিবর্তন: আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ?

সমাজ ও সমাজের নানান অনুষঙ্গ প্রতিনিয়ত পরিবতির্ত হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের কিছু অনুষঙ্গকে কেউ কেউ ইতিবাচক বলেন আর কিছু অনুষঙ্গকে নেতিবাচক বলেন। প্রথমেই কিছু উদাহরণ দেখি, তারপর বিশ্লেষণ করি। এক. ঈদের দিনে ছোটরা বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম করে ও সালামি পায়, এটাই ছিল রেওয়াজ, এখন সালামি আছে কিন্তু সালাম করার কোনো আগ্রহ নতুন প্রজন্মের মধ্যে নেই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কিংবা দেশীয় নতুন কতিপয় মুফতির ফতোয়ার কারণে এখন নতুন প্রজন্ম পা ছুঁয়ে সালাম করা বন্ধ করে দিয়েছে। বরং সালামি এখন বিকাশেও নেওয়া হয়!

দুই. খোলা পিকআপ ভ্যানগাড়িতে সাউন্ড সিস্টেম লাগিয়ে পিকআপভর্তি ছেলেরা নাচানাচি করছে উদ্ভট সব গানের তালে তালে, এটাও আগে কখনো ছিল না। জীবন ঝুঁকিতে পড়া ও সড়ক আইনের নানান ধারার অমান্য করা এবং শব্দদূষণ তো আছেই, সংস্কৃতির দূষণ হচ্ছে কি না তা-ও ভেবে দেখার সময় হয়েছে।

তিন. বর্ষার অবসরে কৃষকেরা আশপাশের বাড়িতে বসে আড্ডা দিত, খেলাধুলায় মনোযোগ দিত কিংবা আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যেত। এখন সেসব নেই। সবাই ঘরে শুয়ে-বসে মোবাইল ও টিভি দেখে সময় কাটায়। শিশু-কিশোরদের বাড়ির আঙিনায় বা জমিতে খেলতে দেখা যেত, গাছে গাছে পাখির বাসা কিংবা জমির সবজি চুরি বা ফল চুরির মতো দুরন্তপনায় কাটত। এখন বাচ্চারা সারা দিন মোবাইল নিয়ে বসে থাকে। আরও অভাবনীয় বিষয় হলো, যদি একটি গ্রামের সব মোবাইল চেক করে ইউটিউব ও টিকটক অ্যাপগুলো চেক করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে তাদের ওয়াচলিস্ট কত জঘন্য রকমের ও নিম্নরুচির। ভাঁড়ামি ও ছ্যাবলামি টাইপের স্বস্তা বিনোদনের যত্ত সব ফালতু ভিডিও দেখে তারা পুলকিত হয় এবং সময় কাটায়। সংগত কারণেই

তাদের সময় অপচয় হওয়া ছাড়াও তাদের চিন্তা চেতনায় দরিদ্রতার ছাপ পড়ে। বিকলাঙ্গ এক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ।

চার. আগের ছনের ঘর বা টিনের ঘর ছিল। ঘরগুলোও স্বকীয়তা বজায় রেখে গ্রামীণ নানান আবহ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এখন সবাই ভবন নির্মাণ করছে। সেসব ভবনের ডিজাইন ও রং দেখলে বোঝা যায় যে নাগরিকদে রুচির উৎস কী। নান্দনিকতা নয়, প্রয়োজন ও সুকুমারবৃত্তি নয়, কেবল টাকার জোরে সবাই ভবন করছে। টাকা যেভাবে কামিয়েছে, সেভাবে তো আর রুচি অর্জন করা যায় না। নতুন বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় যেন ঘরবাড়ি নয়, যেন হোটেল রেস্তোরাঁর রং, মাজার-মসজিদ-মন্দিরের ডিজাইনে তৈরি। নিশ্চয়ই বাড়িঘর, হোটেল-রেস্তোরাঁ, মসজিদ-মাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান–প্রতিটির ডিজাইন, রং, স্টাইল এবং ফ্যাশন তথা স্থাপত্যরূপ আলাদা রকমের হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘরের বাহরে দেখে যদি মাজার মনে হয় আর ভেতর দেখে যদি মোড়ের রংচঙা রেস্তোরাঁ মনে হয়, তবে তা আর বাড়ি হয়ে ওঠে না।

পাঁচ. ভোরে ঘুম থেকে ওঠা গ্রামের লোকদের একটা অভ্যাস ছিল, যা এখন কমে গেছে। কারণ, গ্রামের মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের লোক এখন বসে বসে খায়, তাদের পরিবারে দু'চারজন দেশের অন্য শহরে বা বিদেশে চাকুরি করে টাকা পাঠায় আর তারা বসে বসে খায়। কৃষিকাজ করে না। সংগত কারণেই ৮টার পরে ঘুম থেকে ওঠে।

ছয়. গ্রামে গ্রামে বিদ্যুত দেওয়া হয়েছিল যেন গ্রামে গ্রামে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠে। তা হয়নি। কৃষি সেচ আর গ্রামের ধান ভাঙানোর মেশিন ছাড়া গ্রাম এলাকায় উৎপাদন বা শিল্প খাতে বিদ্যুতের ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। কেবল এসি বা ফ্যানের নিচে শুয়েবসে মোবাইল চার্জ দেওয়া ও টিভি দেখা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না। সাত. মা, দাদু, নানুরা বাচ্চাদের সাথে নিয়ে ঘুমাতে যেত। ঘুমানোর আগে নানান ধরনের কিচ্ছা, গল্প, রূপকথা বলত। সেসব শুনতে শুনতে বাচ্চারা ঘুমাত। এখন বাচ্চাদের মায়েরা দ্রুত বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে নিজেরাই মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনো বাচ্চারাও এসবের সঙ্গী হয়, কখনো হয় না। যা-ই ঘটুক, কিচ্ছা ও রূপকথা শুনে শুনে কল্পনাশক্তি বাড়ার উপায় আর থাকল না।

এ রকম হাজারো উদাহরণ দেওয়া যাবে সমাজ পরিবর্তনের। সমাজ পরিবর্তনের নানান কারণ থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি, নগরায়ণের বিস্তৃতি, বিশ্বায়ন ও আইসিটির ব্যবহার, ধর্মীয় আচারের প্রভাব, মানুষের

জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ইত্যাদি। জীবনধারণের বিভিন্ন অনুষঙ্গের সহজলভ্যতার জন্যও সমাজ পরিবর্তিত হয়। যেমন বিদ্যুৎ, আবাসন, যোগাযোগব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসুবিধা ইত্যাদি কারণেও নানাবিধ পরিবর্তন দৃশ্যমান। জিডিপি বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার কমা, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবর্তন ইতিবাচক। কিন্তু শিক্ষক নিগ্রহ, নারী নির্যাতন, মাদকের ব্যাপকতা, পারস্পরিক অশ্রদ্ধাবোধ তৈরি হওয়া, নৈতিক অবক্ষয়, বাকস্বাধীনতা কমে যাওয়া, সিনিয়র সিটিজেনদের মূল্যায়ন না করা ইত্যাদি নেতিবাচক পরিবর্তন ইদানীং দৃশ্যমান হচ্ছে।

পরিবর্তনই সমাজের নিয়তি। সমাজ সব সময় পরির্তনের প্রক্রিয়ায় ঘূর্ণমান। তবে সেই পরিবর্তন কতটা আলোর দিকে আর কতটা ভালোর দিকে, সেটা ভেবে দেখা জরুরি। সামাজিক কাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এসব বিষয় খেয়াল করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন না করলে নতুন প্রজন্ম ক্ষতির মুখে পড়ে, যার প্রভাব সমাজ ও দেশে পড়ে। হ্যাঁ, এটা সত্য যে নতুন প্রজন্ম আমাদের পুরাতন বিষয়াদি অনুসরণ করবে না। তবে নতুন নতুন যা তারা গ্রহণ করবে, সেটাও যেন সুরুচির হয়, টেকসই উন্নয়নের হয়, সেটা নিশ্চিত করা জরুরি। যদিও রুচি বা সুরুচি নিয়ে বাদানুবাদ আছে, আছে বিতর্ক। কুতর্ক করে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়া কোনো কাজের কথা হতে পারে না। সমাজ পরিবর্তন হয় নানান কারণে। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় কারণে। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারও এখন একটা কারণ। সুতরাং এসব অনুষঙ্গতে বিদ্যমান প্রভাব কী কী ও এসব উপাদান দ্বারা আপকামিং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রভাব কী কী হতে পারে, তা চিহ্নিত করে গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করতে হবে।

সমাজ পরিবর্তন হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে তা প্রতিরোধ করা জরুরি। ন্যায়-অন্যায় বা ভালো মন্দের মানদণ্ড সমাজ দ্বারা নির্ধারিত হয়, যেটাকে আমরা সামাজিক মূল্যবোধ বলি। মূল্যবোধ হলো সমাজের মানুষের আচার-আচরণের মাপকাঠি। সেখানে ধস নামলে পরিবার ও সামাজিক কাঠামোগুলো দৃশ্যমানভাবে পরিবর্তিত হয়ে ভেঙে পড়ে। সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরো সমাজের রূপান্তর হয়। আর এ স্থানান্তর অবস্থায় সমাজে অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান হয় নানাভাবে। বিশেষ করে সমাজে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের গঠন ও বিস্তার নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। ইতিবাচক পরিবর্তন

হোক। কিন্তু নেতিবাচক বিষয়গুলো বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে প্রতিকারের উপায় বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রতিটি সমাজেই যখন অন্ধকার এসেছে, তখন একদল লোক আলোর দিশা দিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির কালো দিকগুলো দূর করে কেবল উজ্জ্বল দিকগুলো সমাজে স্থায়ী হোক, সেই স্বপ্নটি বাস্তবায়নের জন্য সৃষ্টি হোক নব নব রেনেসাঁ, সেই প্রত্যাশা রইল।

এসব নেতিবাচক মূল্যবোধ বা রুচির দুর্ভিক্ষে সংস্কৃতির অধঃপতনের বিষয়গুলো নিয়ে কোনো কোনো অতিমাত্রার স্বাধীন লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণ সাফাই গান। বলেন যে যার যা মনে চায় তা-ই করবে, সেটাই তাদের রুচি। কোনটা সুরুচি আর কোনটা কুরুচি, তা আপেক্ষিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে মানুষের স্বাধীনতা ব্যক্তি পর্যায়ে থাকতে পারে। যা খুশি তা করুক। কিন্তু যে কাজ বা আচরণ সমাজের অন্য মানুষের উপর প্রভাব ফেলে, তা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই চিন্তাভাবনা করে সুবিবেচনাবোধ দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ভাবতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলো মাথায় রেখে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সমাজের সাংস্কৃতিক অভ্যাসগুলোর সৃষ্টি, পুনরাবৃত্তি ও বহাল রাখতে হবে। জাতি গঠন বা সমাজ গঠনে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক মিল ও মেলবন্ধন থাকা জরুরি। বিচ্ছিন্নভাবে নাগরিকেরা যা খুশি তা করতে থাকলে দেশের সামাজিক প্রথা বা রাষ্ট্রীয় আইন মানা নাগরিকের অভাব দেখা দেবে। দেশের আনাচকানাচে নানান অরাজকতা দেখা দেবে। ভেঙে পড়বে পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো, যার প্রভাব রাষ্ট্রেও পড়বে।

জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের নানান দেশ ঘুরেছি। বিশ্বায়ন বা আইসিটি সেসব দেশেও প্রভাব ফেলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লাইব্রেরি বা বই পড়ার সংস্কৃতি তাদের আগেও ছিল এবং এখনো আছে। বিশ্বায়ন বা আইসিটির প্রভাবে হয়তো ই-বুক বা অডিও -ভিডিও কনটেন্ট বেড়েছে কিংবা ই-লাইব্রেরি যোগ হয়েছে। কিন্তু বই পড়া সংস্কৃতি বন্ধ হয়নি। যেখানে বাংলাদেশের আনাচকানাচে লাইব্রেরির সংখ্যা কমছে। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিগুলোও অযত্নে-অবহেলায় থাকে, যথাযথ ব্যবহার হয় না। শিশু-কিশোরেরা মোবাইলে স্বস্তা টিকটকে ব্যস্ত। কোনোভাবেই বই পড়ার সংস্কৃতিতে আগ্রহী হচ্ছে না। উন্নত দেশের ভালো দিকগুলো সেভাবে বাংলাদেশে গৃহীত হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। একইভাবে নেতিবাচক দিকগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে কি না তা-ও দেখা দরকার। যেমন সমকামিতার ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়া, সুগার ড্যাডি সুগার-বেবি চরিত্র ছড়িয়ে পড়া, পরকীয়া বৃদ্ধি

পাওয়া কিংবা পর্নোগ্রাফি সহজলভ্য হওয়া, মাদকের নানান অনুষঙ্গ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়া, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি বা শব্দ বা আচরণ সমাজে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়াদির লাগাম ধরা জরুরি।

সমাজ পরিবর্তন যেন ইতিবাচক হয়, সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা যেন গড়ে ওঠে, সে জন্য শিশু-কিশোরদের জন্য সে রকম শিক্ষা কার্যক্রম ও পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস। সুতরাং শিশু বয়স থেকেই বাচ্চাদের সেভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং এটা করতে হলে আমাদের বড়দের চলাফেরার কালচার (যেমন সত্য বলা ও সততার সহিত উপার্জন এবং ভালো কাজের উদাহরণ সৃষ্টিকরণ) তৈরি করতে হবে। আবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সে ধরনের কালচার (যেমন সুশাসন ও ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনের শাসন বাস্তবায়ন, আইসিটির সঠিক ব্যবহার) প্রদর্শন করতে হবে। যাতে করে আজকের শিশুরা কালকের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

(দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকায় ২০২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত)

সমকালীন কবিতায় গণমানুষের কণ্ঠ থাকে কি?

সমকালীন কবিতা বলতে কোন কালের কবিতাকে বোঝাবে, তা নির্ণয় করা কঠিন। যেমনটা কঠিন আধুনিকতার সময়কালের শুরু ও শেষ ঠাওর করা। সমকালীন কবিতায় কি রবীন্দ্রনাথের কাল আসবে, নাকি জীবনানন্দ, নজরুল, জসীমউদ্‌দীন থেকে শুরু হবে, নাকি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদদের সময় থেকে শুরু হবে, নাকি সত্তর দশকের পরে এখনকার শূন্য দশক কেবল সমকালের হিসেবে আসবে? এ নিয়ে বিতর্ক করা যাবে। কেবল বর্ষ বা যুগ দিয়ে সীমানা ঠিক করা যাবে না, তবে বর্তমানের সাথে সংশ্লেষ আছে বা বর্তমানে প্রভাব ফেলে বা বর্তমানকে রূপায়িত করে–এমন সব কবিতাই সমকালের কবিতা হিসেবে আমলে নেওয়া সমীচীন। সুতরাং বিষয়টা কেবল কালের নয়, বিষয়টা মানুষ, সৃষ্টি, দেশ ও বিশ্বের বর্তমান বাস্তবতা যেসব কবিতায় আমরা এখন পাই, সেসব কবিতাকেই সমকালীন কবিতা হিসেবে মোটাদাগে বিবেচনা করা যায়। কবিরা সব সময়ই সমকালীন হবে। মোদ্দাকথা সমকালীন সাহিত্য বা contemporary Literature মানে বর্তমান সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা, বর্তমান সময়ের ধ্বনি ও ভাষা, বর্তমানের সুর, তাল, লয় ও অনুভূতি, বর্তমান বাস্তবতায় মানুষের কাজ, চিন্তা, বোধ ও লাইফস্টাইলের প্রতিফলন। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে অনেক কবিতা কালকে ছাড়িয়ে যায়। এক কালে লেখা কবিতা পরবর্তীকালেও বাস্তবতার নিরিখে মানুষের কাছে সমান আবেদনময়ী হতে পারে।

কবিদের কবিতায় সমকাল উঠে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইংরেজ হটাও আন্দোলন, দেশ বিভাজন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর অভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের প্রতিটি লড়াই তথা সব ধরনের ইস্যুই কবিদের লেখায় এসেছে। যখন আসে না, তখন বুঝতে হবে সমকালীন কবিরা

সমকালকে অনুধাবন করছে না। কিংবা করলেও কোনো এক অদৃশ্য কারণে তারা লিখছে না। লিখলেও তা প্রকাশ করছে না। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সময়ে তখনকার প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা নিয়ে কয়জন কবি কয়টি কবিতা লিখেছিলেন তা যেমন বিবেচ্য, যা যা লেখা হয় নি তখন তাও বিবেচ্য। তেমনি ২০০০ সাল থেকে ২০২৪ সালে সমকালীন নানান ইস্যুতে কোন কোন কবি কী কী কবিতা লিখেছেন তা যেমন বিবেচ্য, যা যা লেখা হয়নি তা-ও বিবেচ্য। কেন, কখন, কী কী কারণে কারা কারা কী কী লিখতে পারে না, তা বিশ্লেষণ করলেই সমকালের কবিদের সফলতা ও ঘাটতিটুকু অনুধাবন করা যায়।

কবিতা তা-ই, যা কবিতার শরীরে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখে, পাঠককে ভাববার ও কল্পনা করার সুযোগ দেয়, পাঠককে চিত্রকল্প, গল্প, চরিত্র, সময়, জীবনবোধ ও দর্শনে মাতাতে পারে। বর্তমানে সমকালীন কবিতার শরীর দেখলে এটা বোঝা যায় যে কবিতার অবয়বে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও পরিমিত কাব্যালংকার, চিত্রকল্প, রূপক, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ ইত্যাদি স্থান করে নিচ্ছে। একটি প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, কবিতায় কেবল শৈল্পিক দিক থাকলেই হবে, নাকি বাস্তবতাও থাকা দরকার। বাস্তবতাবিবর্জিত শব্দভান্ডার ও ভাষার খেলা যতই শৈল্পিক হোক, তা কি গণমানুষের অনুভূতির কথা বলে? যদি না হয় তবে কবিতার কী কাজ? বিপরীত দিক থেকে ভাবলে কবির কাজ রাজনীতি না। কবির কাজ কবিতা লেখা। কবি কখন কেন কবিতা লিখে কবি নিজেও জানে না। কবিতা এসে যায়, কবিতা হয়ে যায়। এসে যাওয়া বা হয়ে যাওয়ার যে কবিতাসুলভ অনুভূতির রসায়ন তা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাই কবিতা কেবল শৈল্পিক হবে নাকি কেবল বাস্তব হবে, নাকি দুয়ের মিশেল হবে, সেটা বলা মুশকিল। কবির উপর যা ভর করে তা-ই বের হয়। এখন কেউ কেউ বলতে পারেন যে কবি তো আকাশ থেকে আসেন না। কবি এ সমাজেই বাস করেন। কবির সমাজনিরীক্ষা, দেশ নিরীক্ষা, সময় নিরীক্ষা, ঘটনা নিরীক্ষা অন্যদের থেকে আলাদা হবে। কবি তো "সুম্মুম বুকমুন উমম্যুন ফাহুম লাইয়ারজিউন" সমস্যায় আক্রান্ত না। কবি সব দেখেন, বোঝেন ও অনুভব করেন এবং সবকিছু তার ভেতরে অনুরণিত হয়। সেসব অনুরণনের ফল যদি কবিতায় প্রকাশ না পায়, তবে সমকালে তার প্রভাব কমে যায়। আর এসব অনুরণনের ফল যাদের কবিতায় প্রকাশ পায়, সেসব কবির প্রভাব থাকবে পরবর্তীকালেও। কবি তার নিজের মতোই লিখবেন। যেমনটা বলছেন আল মাহমুদ, "আমি কবি/ আমি কথা বলে যাই নিজের ছন্দে/ আমার শব্দ আমারই

গন্ধে-/ আনন্দে মাতে–দু'হাত তুলে।' কবি লিখে যাবেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সেই স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেই সমসাময়িক সমাজ ও মানুষের অনুভূতির নির্যাস উঠে আসবে কবিতায়। কবি বর্তমানকে ধারণ করেন কি না, বর্তমানের সকল ঘটনা বা অনুষঙ্গ কবিতায় আসে কি না, এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার আগেই কবিতায় বর্তমান বহমান থাকা সমীচীন।

অতি সাম্প্রতিক তরুণদের সাহিত্যকর্মগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কবি-সাহিত্যিকেরা একটা অস্থির সময় পার করছেন। অনলাইন মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে নাগরিকেরা যেমন অস্থিরতায় ভোগে, তরুণ কবি-সাহিত্যিকেরা এ ট্রেন্ডের বাইরে যেতে পারে না বলে মনে হয়। লেখালেখিতে আরও বেশি গভীরতার ছাপ থাকা দরকার, যার জন্য কবিদের ধীরস্থির হওয়া যেমন উচিত, তেমনি সময় ও মনোযোগ দেওয়া জরুরি। অবশ্য কবিরা ঔচিত্যবোধের ধার ধারে না। কবিদের ভাবনার জগত ও চলার জগৎ সব সময়ই বাঁধভাঙা। গভীরতার দৌড়ে বাঁধভাঙা হোক। তবে মনে রাখা জরুরি যে দ্রুত জনপ্রিয় হওয়ার যে নেশা, সেই ফাঁদে পা না দেওয়া তরুণ লেখকগোষ্ঠীগুলোর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। জনস্রোতের বিপরীতে হাঁটতে হবে স্বভাবগতভাবে, সাধারণ বদভ্যাস পরিত্যাগ করে গণমানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো অনুধাবন করে করে লিখতে হবে, এমনটাই সাহিত্যবোদ্ধাদের প্রত্যাশা।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে সম্প্রতি কবিতায় ও গল্পে বিদেশি বা ইংরেজি ভাষার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার দৃষ্টিকটুভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশি ভাষা বা ইংরেজি ভাষার ব্যবহার মন্দ নয় বরং তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, বিদেশি ভাষা যেকোনো ভাষায় প্রবেশ করবে, ইংরেজি ভাষাতেও তা ঘটে। কিন্তু সেটা হওয়া উচিত খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেন পাঠক পড়ার সময় হোঁচট না খায়। খটমটে না লাগে। শুনতে আরাম লাগে এমনভাবেই ব্যবহার করা উচিত। যেমন যেসব বিদেশি শব্দ আমাদের বাস্তব জীবনে অহরহ ব্যবহৃত হয়, গণমানুষ সাধারণত ব্যবহার করে, সেসব শব্দ লেখায়ও আসতে পারে। অন্যথায় তা কেবল জোর করে মিশ্রণ হয়, তাতে ভাষা দূষিত হয় বলে মনে হয় এবং পাঠকের জন্য তা সুখপাঠ্য হয় না।

সমকালীন কবিতায় সমাজনিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করতে গেলে দেখা যায় যে সমকালীন কবিদের অনেকেই রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছেন। ক্ষমতাসীনের পক্ষে যেমন আছে ক্ষমতাহীনদের পক্ষেও আছে। ক্ষমতাসীনদের

পক্ষের কবিদের কবিতা পড়লে ক্ষমতাসীনদের কোনো নেতিবাচক দিক পাওয়া যায় না। আবার বিরোধী দলের পক্ষের কবিদের কবিতা পড়লে বিরোধী দলগুলোর কোনো নেতিবাচক দিক পাওয়া যায় না। কবিতায় তাঁদের দেশপ্রেমটাও এমন পুতুপুতু হয় যে তাতে সত্যিকারের দেশপ্রেমটা ঠিক ফুটে ওঠে না। রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতা এখন অনেক কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। যা অপ্রত্যাশিত। কবি হবেন কবির মতো। কবির মনে যা আসবে, অনুভূতিতে যা খেলবে তা-ই তিনি লিখবেন। স্বাধীনভাবে লিখবেন। কোনো ঘরের খুঁটিতে নিজের চুল বাঁধা রেখে লিখবেন না। তাতে কবির সত্যিকারের কবিত্ব প্রকাশ পায় না।

সমকালীন কবিতায় বর্তমান সমাজ, সমাজের মানুষ, মানুষের জীবনাচরণ ও তাদের অনুভূতিগুলোর প্রকাশ কতটা হচ্ছে– তা নিয়ে প্রশ্ন তুললে অবান্তর হবে না। কবিরা এ সমাজে বাস করে। সমাজের নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের কার্যক্রম ও জীবনধারা দেখছে। যদি দেখে থাকে, যদি এসব নিয়ে ভেবে থাকে, যদি কবির মন, এসব দ্বারা দোলায়িত না হয়, যদি কবিতার ঝড় না ওঠে কবিদের মনে তবে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সেসব কবি দূরে বাস করে। বাংলা কবিতার ইতিহাস বলে কবিতা সমকালকে ধারণ করেছে। চর্যাপদের দোঁহা বৌদ্ধধর্মকে ধারণ করেছে, রামায়ণ-মহাভারত হিন্দুধর্মকে ধারণ করেছে, অনুরূপভাবে ইসলামি জাগরণ বা রেঁনেসাঁ নিয়েও কবি ফররুখ আহমদদের যুগ গেছে। তা ছাড়া মানুষের জীবন, সংগ্রাম, পরাধীনতা, নির্যাতিত হওয়া, নগরজীবন, পল্লিজীবন, দুর্ভিক্ষ, মানবাধিকার নিয়ে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কবিদের ভূমিকার প্রমাণ রয়েছে। সে তুলনায় অতি সাম্প্রতিক সমকালীন কবিতায় সামাজিক দায়বদ্ধতা যদি কিছু পালিত হয়ে থাকে, তবে তা খুবেই ম্রিয়মান।

কবিতার আধুনিক যুগের শুরু থেকেই সমাজের অবহেলিত শ্রেণির চিত্রায়ণ কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের কবিতা উল্লেখ করা যায়।

কবি কামিনী রায়ের "সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে",

রবীন্দ্রনাথের "এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি",

কবি নজরুলের "গাহি সাম্যের গান",

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে'র "অর্থের উৎপাতে '/ পুরুষার্থ নির্ণিত যে সমাজের উঁচু নিচু স্তরে/ যুগে যুগে ইতিহাস বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর",

সমর সেনের "বণিকেরা প্রাকার বানায়/ দিনে দিনে চক্রবৃদ্ধি হারে/ নিরন্ন বেকারের মজুরের ভিখারির সংখ্যা বাড়ে।"

এমনকি নিকট অতীতের সুকান্তের কবিতাতেও শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার ও বঞ্চনার কথা ধ্বনিত হয়েছে।

হালের বাংলাদেশের কবিতায় অবহেলিত শ্রেণির উপস্থিতি সে রকমটা উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায় না। যতটা পাওয়া যায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালীদের স্তুতি ও জয়গানের রেখা। কবিতায় বঞ্চিত শ্রেণির নিদারুণ বাস্তবতা উঠে আসাটা স্বাভাবিক। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন লিখছেন, "আমি কবি যতটা কামারির আর কাঁসারির আর ছুতোরের/ মুটে মজুরের/ আমি কবি যত ইতরের।" অবহেলিতদের কথা যাঁদের কবিতায় আসে না তাঁদের জন্যও প্রেমেন্দ্র স্মর্তব্য। "কোমরের জোর কমে গেল যার ভাই/ ঘুণ ধরে গেল কাঠে...।"

বাংলাদেশের কবিতার চেতনাজগৎ নির্মিত হয়েছে জীবনবৈচিত্র্য, গতি ও সংঘর্ষ, সংক্ষোভ ও যন্ত্রণা, শ্লাঘা ও বেদনা এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক যুদ্ধ, ঝড়ঝঞ্ঝার উত্তাল ঢেউ দিয়ে। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের পরে বাংলাদেশ অঞ্চলের কবিতার দিকে তাকালে আমরা সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারব। শামসুর রাহমানের "আমরা যখন ঘড়ির দুটো কাঁটার মতো/ মিলি রাতের গভীর যামে/ তখন জানি ইতিহাসের ঘুরছে কাঁটা পড়েছে বোমা ভিয়েতনামে।"

কিংবা আল মাহমুদের "তাড়িত দুঃখের মত চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল/ রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখে উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে/ তীরের ফলার মতো/ নিক্ষিপ্ত ভাষার চিৎকার।"

অথবা শহীদ কাদরীর "শৃঙ্খলিত, বিদেশীর পতাকার নীচে আমরা শীতে জড়সড়/ নিঃশব্দে প্রেমিকের দীপ্ত মুখ থেকে জ্যোতি ঝরে গেছে।"

এসব কবিতায় ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে সমাজের মুক্তিকামী মানুষের দহনঅগ্নিগোলায় প্রকাশিত হয়েছে। বলার অধিকার, ভাষার অধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। অনুরূপভাবে স্মরণ করা যায় আহসান হাবীবের "কোথাও পড়ে না চোখে বধ্যভূমি, অথচ প্রত্যহ/ নিহতের সংখ্যা বাড়ে। কোথাও একটিও/ লাশ কিংবা কবর পড়ে না চোখে, অথচ প্রত্যহ/ শবাধার ব্যস্ত হয়ে হেঁটে যায় এবাড়ি ওবাড়ি।"

কিংবা আবুল হোসেনের " অনেক শেখানো অনেক পড়ানো/ বহু পুরুষের মর্চে ধরানো/ ভাগ্যটার/ ঝুঁটি ধরে নাড়া দেবার সময়/ এসেছে এবার..."

আর আজীজুল হকের "একটি কবিতা একজন কবির হৃৎপিণ্ড-চিবিয়ে খাচ্ছে রক্ত/ একটি স্বপ্ন একজন প্রেমিকের চোখ উপড়ে নিচ্ছে রক্ত/ রক্ত রক্ত রক্ত/ উন্মোচিত জরায়ুতে কি এতো রক্ত থাকে?"

এভাবেই ভাষা আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম দেশ ও বিশ্বে বিস্তৃত হয়, গ্রামে গ্রামে সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কবিদের মানসজগৎ তখন নতুন চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। বিদেশি হটিয়ে দেশীয় হন্তারকদের কবলে পড়ে দেশ, বর্গিদের রক্তচোষণে ক্ষয়ে যায় সমাজের সকল সম্পদ। কবিদের চোখ তা এড়ায় না। এড়াতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের বেঁচে থাকার বেদনা কবিদের জানা। রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ ও আবুল হাসান কবিতায় সমাজ মানসের সেই উজ্জীবন, পরাভবচেতনা ও উজ্জীবনের শক্তি উন্মোচনে বহুলাংশে সমর্থ হয়েছেন। সমাজজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে অনেক কবিই জীবনের নতুন সত্য অনুধাবনে সমর্থ হন এবং কবিতায় রূপ দেন। সত্তোরের দশকে আবির্ভূত কবিদের কবিতায় যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজের অনিশ্চয়তার চিত্র পাওয়া যায়। স্বপ্ন ও প্রেমের পাশাপাশি স্বপ্নভঙ্গের গন্ধও রয়েছে নানান কবিতায়। "জন্মই আমার আজন্ম পাপ" কিংবা "আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই" ধরনের পঙ্‌তিগুলোতে সমাজ নিরীক্ষার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। আশির দশকেও সেটা বহাল ছিল। কিন্তু নব্বই বা শূন্য দশকের পরে সমাজের নিপীড়িত ও অবহেলিত শ্রেণির শোষিত হওয়ার কথা কিংবা রক্তচোষাদের হোলি খেলার কথা কতটা কবিতায় পাই, তা নিয়ে প্রশ্ন দেদীপ্যমান। সত্তর-আশির দশকের কবিদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা, আবেগ ও যন্ত্রণার যে তীব্রতা, শূন্য দশকের কবিদের মধ্যে নিকট অতীতের যুদ্ধংদেহী চেতনা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। সমাজ ও জীবনের অব্যাহত ভাঙন কবিদের মধ্যেও এনে দিয়েছে বিস্মৃতি ভাব, দেখে না দেখার অভিনয়, শুনে না শোনার ভান। যত সব এলোমেলো ভাব খেলা করে যেন হালের অনেক কবিদের মাঝেই। জীবনের একদিক গেলে আরেক দিক আসবে, সভ্যতার এক পাড় ভাঙলে আরেক পাড় ভাসবে, শিল্প-সাহিত্যে আমরা এসব দেখেই অভ্যস্ত। কিন্তু বাংলাদেশে যে ভাঙনের খেলাই দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। গণমানুষের অধিকারের বোধগুলো যে ডালে বান্ধে বাসা, সে ডালই যেন ভেঙে পড়ে। সেই ভেঙে পড়ার স্রোতে কবিরাও যেন দাঁড়াতে পারে না। দাঁড়াতে

পারে না মেরুদণ্ড সোজা করে স্রোতের বিপরীতে, কবিতার হাতিয়ার নিয়ে। আনোয়ার জাহিদ তাই লেখেন, "এই জেনারেশন পায়নি কোনো প্রেম/ জেগে উঠবার পর থেকে শুনেছে শুধু/ ভাঙনের ঘণ্টাধ্বনি/ অগ্রজের দীর্ঘশ্বাস/অদ্ভুত রাজনীতির রঙিন ঠোঁটের হাসি..."

যা-ই হোক, ব্যক্তিগত বিষয় ও আত্মকেন্দ্রিক শব্দ ও ভাষার খেলায় কবিগণ আত্মনিয়োগ করেন। তবে সমষ্টিগত সামাজিক, দেশীয় ও বৈশ্বিক বিষয়াদি কবিতায় এড়ানো যায় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলে আসে কবির চরণে চরণে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষঙ্গগুলোর বাস্তব ক্রিয়া-বিক্রিয়া খেলা করে কবির মানসজগতে। কবিকে করে আত্মঅনুসন্ধানী ও সত্যানুসন্ধানী। এর প্রভাব যখন পড়ে কবিতায়, তখনই কবিতা হয়ে ওঠে প্রাসঙ্গিক, টিকে যায় সেই কবিতা, হয় কালোত্তীর্ণ। বাংলাদেশের কবিতা সমাজবিচ্ছিন্ন কখনোই ছিল না। এখনো তা থাকবে এমনটা কাম্য নয়। বরং প্রত্যাশা, ব্যর্থতা কিংবা যন্ত্রণার যে ব্যক্তিক ও সামষ্টিক রূপ, তা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বহুমুখী ভাঙা-গড়া ও উত্থান-পতনে বহমান থাকবে। কবিতায়ও তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিত্রায়িত হবে কাব্যিক সব লীলা নিয়ে।

(২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারিতে *দ্য ডেইলি স্টার* বাংলার সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত)

দেশপ্রেম বলতে কি কিছু আছে?

অস্ট্রেলিয়া বা জাপানে যখন ছিলাম, তখন দেশের জন্য মন কাঁদত, দেশের যেকোনো ঘটনায় উত্তেজিত হতাম। আনন্দের হলে উদ্বেলিত হতাম, আর হৃদয়বিদারক হলে গোপনে চোখ মুছতাম। দেশের ইতিহাস, বাস্তবতা, বর্তমান, সংস্কৃতি, ধর্ম যেকোনো বিষয়ে মন কাতর হতো। এটা প্রবাসীমাত্রই জানে ও টের পায়। প্রবাসজীবনে মানুষ যতটা দেশকে নিয়ে ভাবে ও অনুরণিত হয়, ততটা অন্য সময় হয় কি না, আমি জানি না।

আবার স্কুলের অ্যাসেম্বলির সময় যখন জাতীয় সংগীত গাইতাম, তখনও আমাদের মনে দেশপ্রেম জেগে উঠত। সবুজ বাংলাদেশকে ভেবে প্রাণের বাংলাদেশকে চিন্তা করে মন উতলা হতো। দেশের স্বাধীনতা আনতে যারা জীবন দিয়েছেন, দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় যেসব মানুষ জীবন বাজি রেখে লড়েছেন, তাঁদের কথা ভেবে গর্বিত হতাম। আমাদের ভেতরেও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। আসলে এ রকমভাবে অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে যেখানে গণমানুষ কীভাবে দেশপ্রেমে আক্রান্ত হয়, আবেশিত হয়, গ্রহণ করে ও দেশপ্রেম লালন করে এবং সেই দেশপ্রেম থেকে যেকোনো ত্যাগ করতে তারা রাজি থাকে।

তেমনি ভাষা আন্দোলনে ভাষার গান শুনে, মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তির গান শুনে, গণ-অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী গান শুনে আমরা উতলা হই, উজ্জীবিত হই। দেশের গান শুনে, বিদ্রোহের কবিতা শুনে আমরা জেগে উঠি, জ্বলে উঠি, সোচ্চার হই, জীবন বাজি রাখি। এগুলো নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমের লক্ষণ বা চিহ্ন। এ রকম ঘটনা পৃথিবী জুড়ে নানান দেশে নানানভাবে আছে।

গণমানুষের এ বোধ, এ অংশগ্রহণ, এ অনুভূতি নিশ্চয়ই দেশপ্রেম। দেশের প্রতি তাদের অগাধ প্রেম, প্রগাঢ় ভালোবাসা। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাহলে দেশপ্রেম হচ্ছে একজন ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠী কর্তৃক মাতৃভূমির

প্রতি একধরনের আবেগপূর্ণ অনুরাগ বা ভালোবাসা। মানুষের জাতিগত, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অথবা ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশভেদে দেশপ্রেমের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হলেও ব্যাপারটা আসলে এক ও অভিন্ন এবং দেশপ্রেমিক বলতে বোঝায় এমন সব ব্যক্তি, যাঁরা দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত। আরবি ভাষায় একটি কথা আছে, 'আল্ হব্বুল ওয়াতান মিনাল ইমান,' অর্থাৎ 'দেশপ্রেম হচ্ছে ইমানের অঙ্গ।' যাঁর অন্তরে দেশপ্রেম আছে, ধরে নিতে হবে যে তাঁর ইমানও আছে; পক্ষান্তরে যাঁর অন্তরে দেশপ্রেমের দীপশিখা প্রজ্বলিত নেই, তাঁকে মোমিন বলে অভিহিত করলেও ধরে নিতে হবে যে তাঁর ইমান পরিপূর্ণ নয়। ছোটবেলায় একটি নাতে রাসুল শুনেছিলাম, "জন্মভূমির মায়ায় নবী ফিরা ফিরা চায়...।" মানে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় নবীজির কষ্ট লেগেছিল।

বর্তমানেও গণমানুষের মধ্যে এ রকম দেশপ্রেমী ও জন্মভূমিপ্রেমী পাওয়া যাবে। দেশীয় পন্য কিনবে, দেশের জিনিস খাবে। দেশের টাকা দেশে রাখবে। এ রকম দেশপ্রেমী অনেক আছে।

কিন্তু আরেক গ্রুপ আছে যারা এসব দেশপ্রেমের ইস্যু তৈরি করে, জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে, ও মানুষকে মাতিয়ে তুলে পরে সটকে পড়ে কিংবা নিজেদের ক্ষমতায় বসিয়ে সবকিছু ভুলে যায়, তারা কারা? তারাই আসলে মূল হোতা। তাদের কাছে এটা কি দেশপ্রেম? জাতিপ্রেম? বা দাবি আদায়ের লড়াইয়ের চেতনা থাকে? আমার মনে হয় না। তারা খুব সুচিন্তিতভাবে এসব দেশপ্রেমের জাতিপ্রেমের কথা বলে বেড়ায়। এগুলো বলে বলে তারা মানুষকে খেপিয়ে তোলে। জীবন বাজি রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। পরে ঘটনা ঘটে যাবার পরে তারা কয়েকজন ক্ষমতার বলয়ে ঢুকে যায়। তারা শাসক হয়ে যায় এবং শাসকদের চিরাচরিত চরিত্র গ্রহণ করে ফেলে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, গণদাবি কিছুই কাজ করে না। তারা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মোহে লিপ্ত হয়ে যায়। আর যারা তাদের কথায় উজ্জীবিত হয়ে জীবন দিয়েছে, আহত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা বা তাদের আত্মীয়স্বজন আর কিছুই পায় না। তারা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে সামান্য অনুকম্পা বা স্মরণসভায় স্মরণ হয়ে থাকে। তারা বাস্তবে কিছুই পায় না। সেটা না পাক। এমনকি যেটার জন্য তারা জীবন দিল বা আহত হলো, সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য, সত্যিকারের মানবাধিকারের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, সকলের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য, সেগুলোও অর্জিত হয় না। বরং শাসনক্ষমতায় যারা

আসে তারা আগেকার শাসকদের চেহারায় শোষক রূপ ধারণ করে। লর্ড ক্লাইভ বা মিরজাফরের সাথে যেমন জিন্নাহ-ইয়াহিয়ার কোনো পার্থক্য নেই, তেমনি '৭১ এর পরে সকল্ আমলে যারা যারা ক্ষমতায় গিয়েছে ও গণদাবি উপেক্ষা করেছে, ক্ষমতার লোভে সকল অন্যায়, গুম-খুন, টর্চার করেছে, ভোট কারচুপি করেছে, তারাও মূলত ওই ক্লাইভ-মিরজাফর-জিন্নাহ-ইয়াহিয়ার মতোই। বরং আরও নিকৃষ্ট। ওয়াদা ভঙ্গকারী নাফরমান ও বাটপার। এদের কাছে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম বা আদর্শচেতনা কিছুরই মূল্য নেই। এরা এগুলো ব্যবহার করে গণমানুষকে জমায়েত করার জন্য, মিসগাইড করার জন্য, প্রতারণা করবার জন্য, নিজেদের আখের গোছাবার জন্য তারা দেশপ্রেমের নাটক করে, মানবাধিকারের কথা বলে।

বিখ্যাত লেখক অ্যান্ডারসনের "ইমাজিনড কমিউনিটিজ" বইয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এলিটরা গণমানুষের মাথার ভেতরে চেতনা তৈরি করে ও মিসগাইড করে। মানুষকে খেপিয়ে তোলার জন্য এটা মোক্ষম অস্ত্র। যেমন একজন বাংলাদেশি বাংলাদেশে বাস করে। যদি দেখে যে কোনো এক বাংলাদেশি ব্রিটেনে আক্রান্ত হয়েছে বা সমস্যায় আছে তখন তার মনে চোট লাগবে। অন্য দেশের লোক হলেও লাগবে, তবে নিজের দেশের হলে বেশি লাগবে। আরেকজন মুসলিম, যদি দেখে যে অন্যদেশের কোনো মুসলিম আক্রান্ত হয়েছে, তবে সে কষ্ট পাবে, অন্য ধর্মের হলেও কষ্ট পাবে। তবে নিজের ধর্মের হলে একটু বেশি কষ্ট পাবে। যদিও এ দুজন তার পরিচিত না, তবু তার মনের ভেতরে বাড়তি চাপ তৈরি হবে। একই জাতির, একই দেশের, একই গ্রামের, একই ধর্মের, একই জেন্ডারের হলে তার জন্য মন বেশি কাঁদে। এ সফট ফিলিংটাকেই কাজে লাগান সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এলিটরা। এর মাধ্যমেই গণমানুষকে খেপিয়ে তুলতে পারে।

আমার গ্রামের পাশের গ্রামে দুই গ্রুপের মারামারিতে একজন নিহত। ছোট গ্রামটির নাম নিমবাড়ি। যে মরেছে আর যারা মেরেছে তারা সবাই একই গ্রামের ভাই। একসাথেই দশকের পর দশক মিলেমিশে চলে। বিয়ে, খতনা একসাথে খায়। বাজারে যায়; বিলে কাজ করে; ঈদের মাঠে কোলাকুলি করে; শুক্রবারের জুমায় খুতবা শোনে; শীতকালের মাহফিলে হুজুরের ওয়াজ শোনে; পাশাপাশি বসে গাল ভিজিয়ে অশ্রু ফেলে। কীভাবে সম্ভব মেরে ফেলা! আমি ভেবেই পাই না।

ছোটবেলায় এ রকম মারামারি দেখেছিলাম। দুপাশে দুগ্রাম। মাঝখানে

সবুজ প্রান্তর। সবার হাতে বল্লম, মুলি (বাঁশের ধারালো কঞ্চি), রামদা, ইট ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে এলোপাতাড়ি নিক্ষেপ করছে। আমি দূর থেকে দেখছিলাম। পাশে বয়স্ক মুরব্বি। তিনি চিৎকার করে বলছেন, "গ্রামের মান বাঁচাও", "গ্রামের মান বাঁচাও"। আর এ চিৎকারে গ্রামের জওয়ানদের গ্রামপ্রেম উতলে ওঠে আর ঝাঁপিয়ে পড়ে!

রাষ্ট্র পর্যায়ে "জাতীয়তাবাদ" যেমন ট্রাম্প-বুশরা ব্যবহার করেন; গ্রাম পর্যায়ে "গ্রামের মান বাঁচাও", "গোষ্ঠীর মান বাঁচাও" নামক গ্রামপ্রেম/গোষ্ঠীপ্রেমের/ধর্মপ্রেমের চরম অপব্যবহার হয়। সেই ছোটবেলায় বুঝেছিলাম যে মুরব্বি ভুল বলছেন।

রাজনৈতিক দলগুলো, ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো, সংগঠন বা এনজিওগুলো এমন নানান ধারণা ও চেতনার স্লোগান নিয়ে এসে হাজির হয়। আর গণমানুষ লাখে লাখে, হাজারে হাজারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হয়তো সাময়িকভাবে যুদ্ধ, জীবন ও ত্যাগ দ্বারা চাহিত লক্ষ্য অর্জিত হয়, তবে আসল যে রূপকল্প তথা মানুষের মুক্তি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তা আর অর্জিত হয় না। মানুষ বাঘের মুখ থেকে কুমিরের মুখে পড়ে। এটুকুই পার্থক্য।

স্বাধীনতা ও মুক্তি পেতে, অধিকার ও সচ্ছলতা পেতে, মর্যাদা ও আভিজাত্য পেতে, আর শান্তি ও সুখ পেতে মানুষ কতবার কতভাবে জীবন দিয়ে লড়েছে। পুরো বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাগ হয়েছে, ভিন্ন ধর্মে ভাগ হয়েছে, ভিন্ন গোত্র ও সমাজে ভাগ হয়েছে। টুকরা টুকরা হয়েও সেসব অর্জিত হয়নি। দেশের ভেতরে আবার নানান বিভাজন। নানান দল-উপদল। ধর্মের মধ্যে আবার নানান ফেঁকড়া ও বিভক্তি। গ্রামে গ্রামে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, এমনকি ঘরের ভেতরেও বিভাজন। এ খেলা শেষ হবার নয়। যারা দেশ ভাগ করে, সমাজ ভাগ করে, ধর্ম ভাগ করে, গোত্র ভাগ করে, তারা আসলে নিজে শাসক হওয়ার জন্যই করে। তারা শাসক হওয়ার পরে নিজেরাই শোষক বনে যান। তখন গণমানুষকে আবারও মুক্তি পেতে নতুন কোনো বিষয়ে নতুন কোনো লড়াই করতে হয়। যে কারণে পৃথিবীতে শান্তির লক্ষ্যে নানান দেশ, ধর্ম, সংগঠন গঠিত হওয়ার পরেও মানুষের মুক্তি মেলেনি। মানুষ এখনো দৌড়ের উপরই আছে।

দেশপ্রেম দেখিয়ে দেশে দেশে যুদ্ধ হয়, ধর্মপ্রেম দেখিয়ে ধর্মে ধর্মে ভাগ হয়ে লোকেরা যুদ্ধ করে, তেমনি আইডিয়া, ধারণা, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়

মতবাদে দল-উপদলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ শেষ হলে নিজেদের মধ্যে আবার কোনো স্বার্থ নিয়ে লাগে, তখন আবার নতুন বিভাজনের সুর তৈরি করা হয়। তথা বিভাজন ও শোষণ যেন নিয়তি। জনতা এলিটদের বাজানো বয়ান শুনে শুনে উইপোকার মতো আগুনে ঝাঁপ দেবে, আর ঘটনার জয়ের পরে এলিটরা ক্ষমতার মসনদে বসে আবার আগেকার শাসকদের মতোই শোষণ করবে। জনতা শোষিত হবে। নতুন শোষণ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে আবার আরেক দল জেগে উঠবে। সেই দল আবার নতুন কোনো ধারণা বা তত্ত্ব বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে জনতাকে ভাগ করবে, উজ্জীবিত করবে। জনতা আবার আন্দোলনে যোগ দেবে। আবারও জয় হবে। জয়ের পরে এলিটরা নতুন করে আবার শাসক হয়ে বসবে ও আগেকার শাসকদের মতোই শোষণ শুরু করবে। এর মধ্য দিয়ে তথাকথিত জনতার লড়াই বা বঞ্চনার কোনোটাই ইতি হয় না। হয়তো নতুন কিছু লোক রাজনৈতিক ও সামাজিক মসনদে বসার সুযোগ পায়। বাকিদের অবস্থা তথৈবচ।

এ রকম সমস্যা বিশ্বজুড়েই আছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব দেশপ্রেম, চেতনা, ধর্মপ্রেম, জাতিপ্রেম, ভাষাপ্রেম ইত্যাদির অপব্যবহার দেখা যায় বেশি। বাংলাদেশেও একই অবস্থা। আমরা দেশকে ভালোবাসি ঠিকই কিন্তু যতটা না ভালোবাসি, তার চেয়ে বেশি ভালোবাসা দেখানোর চেষ্টা করি। গলায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে হলেও প্রচার করতে চাই আমি দেশপ্রেমী। এ রকম লোকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। কথিত এলিটদের এ রকম আচরণে গণমানুষও সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। যদিও কেউ কেউ আবার সত্যি সত্যি মনের গভীর থেকে দেশকে ভালোবাসে, নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। দেশের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য নয় দেশকে কিছু দেওয়ার জন্য। অনেকে আবার দেশকে ভালোবাসতে চেয়েও ভালোবাসতে পারে না তাদের পদ্ধতিগত ভুলের কারনে বা পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে। এখন স্বার্থপর, লোভী, শঠ এলিটদের কারণে মাঝেমধ্যে মনে হয় দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ইত্যাদি স্লোগানগুলো খুবই সস্তা বিষয়। যা অপব্যবহার করে পথভ্রষ্ট এলিটরা সমাজ ও দেশের ক্ষতি করছে।

এ রকম দেশপ্রেমের অপব্যবহার যেমন ভালো নয়, তেমনি অতি দেশপ্রেমও আবার ক্ষতিকর। যেমন জার্মানিতে জাতিহত্যার যে চেষ্টা কিংবা সুদান বা মায়ানমারে জাতিগত দাঙ্গার যে হিংস্র আক্রমণ, তাতে এটা পরিষ্কার, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ ক্ষতিকরও হতে পারে। আসলে ছুরি দিয়ে আমরা আপেল

কাটব নাকি মানুষ কাটব, তা আমাদের সমস্যা। ছুরির কোনো দোষ নেই। দেশপ্রেম, অধিকারের লড়াই, মানবাধিকার কর্মযজ্ঞ। এগুলো উত্তম কাজ। যতক্ষণ না এগুলোর ব্যবহার করে কেউ স্বার্থ উদ্ধার করে। যতক্ষণ না নিজের আখের গোছানোর চেষ্টা করে, যতক্ষণ না শাসক হয়ে শোষণ করার পাঁয়তারা করে। ততক্ষণ পর্যন্ত দেশপ্রেম উত্তম জিনিস।

অতিরিক্ত কোনো কিছুই যেমন ভালো নয়, তদ্রূপ অতিমাত্রায় 'দেশপ্রেমও' বাঞ্ছনীয় নয়। ইংরেজি ভাষায় এ প্রসঙ্গে দুটি আলাদা শব্দই আছে–'শভিনিজম', অর্থাৎ উৎকট স্বদেশপ্রেম ও 'জিংগোইজম', অর্থাৎ সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জার্মানদের উৎকট ও সংগ্রামপ্রিয় দেশপ্রেমই ছিল পৃথিবীতে দু–দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। বোধ করি এ কারণেই প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক মোপাসা পরিহাসভরে বলে গেছেন, 'দেশপ্রেম হচ্ছে একটি ডিম, যা ফুটে যুদ্ধের জন্ম হয়।' অতএব আমরা সবাই অবশ্যই দেশপ্রেমী হব, তবে অতি-দেশপ্রেমী হব না এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতির প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করব না।

আর যারা দেশপ্রেম, ধারণা, চেতনা বিক্রি করে ব্যবসা করে, স্বার্থ উদ্ধার করে, ক্ষমতায় যায়, শোষণ করে, দেশের সম্পদ তছরুপ করে, তাদের কথায় বিশ্বাস করব না, ভোট দেব না, এ হোক অঙ্গীকার।

পোশাক বা বোরখা-বিতর্ক : কতটা সমীচীন?

১.

আমি যখন খুব ছোট, তখন মা-নানু-দাদি ও চাচিদের কেবল শাড়ি পরতে দেখতাম। আমরা যখন বেড়ে উঠি, তখন কিশোরী খালা বা বোন বা ক্লাসমেটদের দেখতাম সালোয়ার-কামিজ পরতে। কিন্তু মা-নানি দাদিদের সালোয়ার কামিজ পরতে দেখিনি। ঢাকাতে এসে দেখলাম মা-নানি বয়সীদের অনেকেই সালোয়ার-কামিজ পরে। সেটা প্রথমে আমার চোখে খটকা লাগলেও পরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ইদানীং দেখা যায় গ্রামে শাড়ি পরে এমন মানুষ কম। বেশির ভাগ সালোয়ার-কামিজ পরে। এ পরিবর্তনও আমার চোখে লাগে।

আবার নানা ও বাবাকে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরতে দেখেছি। কৃষকদের লুঙ্গি কাছা দেওয়া বা নেংটিতে দেখেছি, স্কুলশিক্ষকদের পাঞ্জাবি-পায়জামাতে দেখেছি। আবার কেউ কেউ প্যান্ট-শার্ট পরে ফুলবাবু হয়েও থাকতেন। ঢাকায় গিয়ে ভিন্ন চিত্র দেখি। বেশির ভাগই প্যান্ট-শার্ট পরে। গত বিশ বছরে মেয়েদের সালোয়ার-কামিজে আর পুরুষদের প্যান্ট স্টাইলে অনেক বিবর্তন দেখেছি। মানুষ তার শিক্ষাদীক্ষা, ক্ষমতা, অর্থ, কৌশল ও রুচি পোশাকে দেখাতে চায়। সে পুরুষ হোক বা নারী হোক।

জাপান ও অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে রাস্তাঘাটে ও সি বিচে প্রথম প্রথম আড়ষ্ট লাগত। অভ্যস্ত হতে সময় লেগেছে। যে পোশাক দেখলে মনের মধ্যে আরে রে রে করে উঠত, সেগুলোই দীর্ঘদিন থাকার কারণে চোখে নরমাল ঠেকেছে। খুবই স্বাভাবিক লেগেছে। অথচ প্রথম প্রথম নিতে কষ্ট হতো। কালচারাল শক নিতে বা মানসিক প্রস্তুতিতে সময় লেগেছে। আসলে আমরা যে কালচারে খাই, চলি বা পরি, অন্য কালচারে গেলে তা গ্রহণে সাময়িক অসুবিধা হয়। তবে দীর্ঘ অভ্যাসে তা স্বাভাবিক মনে হয়। আমাদের গ্রহণক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ে। ছকের বাইরে আমরা সহজে চিন্তা করি না। চিন্তা করলে ও মিশলে পরিবর্তন হয়ই।

২. পোশাকের প্রয়োজন ও বিবর্তন

সৃষ্টির শুরুতে মানুষ কী ধরনের পোশাক পরত বা আদৌ পরত কি না, তা জানা যায় না। ধর্মীয় মতে আদম-হাওয়া প্রথম মানুষ হিসেবে কী পরতেন, সেটাও নিশ্চিত না। হয়তো আবরণ ছিল কোনোভাবে যা আমাদের চিন্তার বাইরে। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষ শুরুতে খাওয়া নিয়েই লড়াই করত। পরিধান নিয়ে ভাবার সময় পায়নি। বস্ত্র মানুষের দ্বিতীয় মৌলিক প্রয়োজন। শীত, ঠান্ডা, রোদ, তাপ থেকে বাঁচতে মানুষ শুরুতে হয়তো কিছু পরতো। যেমন গাছের পাতা বা ছাল বা পশুর চামড়া ব্যবহার করত। পরে সভ্যতার ধাপে ধাপে পোশাকের পরিবর্তন ঘটে। বয়নশিল্প আসে অনেক পরে। আর শিল্পবিপ্লবের পরে তো পোশাকের ধরন ও বৈচিত্র্যের কোনো ইয়ত্তা নেই।

পৃথিবী নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তাচেতনা, সহনশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতার নানান স্তর পেরিয়ে মানুষ আজকের দিনে এসে দাঁড়িয়েছে। গরম-শীতে পোশাক ভিন্ন হয়। আবার গরমেও ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রার জামা ও ২৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার জামা এক নয়। শীতেও ৫ ডিগ্রির তাপমাত্রার জামা আর মাইনাস ১০ তাপমাত্রার জামা এক নয়। আফ্রিকার পোশাক-প্রয়োজনীয়তা আর ইউরোপের পোশাক-প্রয়োজনীয়তা এক হবে না। এমনকি একই দেশে দুই জায়গায় ভিন্ন হতে পারে। যেমন জাপানের ওকিনাওয়ার পোশাকি প্রয়োজন ও হোক্কাইডোর পোশাকি প্রয়োজন এক হবে না। মক্কার পোশাকের সাথে ভারতের পোশাকের বেমিল হবেই।

ধর্ম আমাদের পোশাকে পরিবর্তন দিয়েছে। প্রতিটি ধর্মের কিছু আলাদা পোশাকি ম্যানার আছে। সংস্কৃতিভেদেও পোশাক ভিন্ন হয়। এমনকি বান্দরবানের ১৪টি উপজাতির পোশাক একরকম নয়। যদিও একই জেলায় বাস করে। আবার রয়েছে রাজনৈতিক পোশাক। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরও নানান রকম পোশাক হয়। বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলগুলোর মধ্যেও পোশাক, পাঞ্জাবি ও টুপির মধ্যে নানান রকম ভেদাভেদ দেখা যায়। সুতরাং কে কোন কাপড় কতটুকু কখন পরবে, তা বলা মুশকিল। কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন হতেই পারে। এক দেশের লোক বলবে তার দেশের পোশাক সেরা, এক ধর্মীয় লোক বলবে তার ধর্মের পোশাক সেরা, এক সংস্কৃতির লোক বলবে তার সংস্কৃতির পোশাক সেরা। এ রকম দাবি করা কি অন্যায়? না অন্যায় নয়। দাবি করুক। প্রচারও করুক। তবে জোর করা

যাবে না। চাপিয়ে দেওয়াও যাবে না। যার মনে ধরবে যেটা, সে গ্রহণ করবে সেটা।

ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ বছর আগে রেশমশিল্পের আগমন। কালক্রমে শাড়ি ও ধুতিই ছিল এ এলাকার মানুষের প্রধান পোশাক। ধুতি-লুঙ্গির প্রচলন ছিল কিছুকাল আগেও। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই ধুতি-লুঙ্গি পরত। কাজী নজরুলও ধুতি পরতেন। মোগল আমল থেকেই পাগড়ি বা কুর্তা পরার অভ্যাস দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে লম্বা কুর্তা বা পাঞ্জাবি পরতেন, তার সাথে বর্তমানে পুরুষদের লং পাঞ্জাবি বা মেয়েদের লং কামিজ বা বোরখার মিল পাওয়া যায়। মুসলমানদের আগমনের ফলে বাংলায় পোশাকে একটা মুসলিম আবহ আসে। মুসলমানরা আসার আগে এ অঞ্চলে সেলাই করা কাপড় পরতো না। সেলাই করা কাপড় মুসলমানরাই প্রচলন করে। আবার ব্রিটিশরা আসার পরে ব্রিটিশদের পোশাকি আমেজ এ অঞ্চলে প্রভাব ফেলে।

সভ্যতা-অসভ্যতা, আবহাওয়া, নারী-পুরুষ, ফ্যাশন ও স্টাইল, ট্র্যাডিশন ও আধুনিকতা, জাত পাত ও শ্রেণি, ধর্মবিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ ধারণা ইত্যাদির ভিত্তিতে পোশাক ভিন্ন হয় ও পরিবর্তিত হয়। সুতরাং পোশাকের রাজনীতি ছিল, আছে, থাকবে। রাজনীতিতে পোশাক ছিল, পোশাকেও রাজনীতি আছে। ধর্মে পোশাক ছিল, পোশাকেও ধর্ম আছে!

৩. পোশাক বিতর্ক

সংগত কারণেই পোশাক নিয়ে আইন-আদালত, আতেল-বুদ্ধিজীবী, প্রশাসন, পুলিশ ও আমজনতা নানান মন্তব্য করছে। একেকজন একেক দিক ফোকাস করছে। তাই বিতর্ক বাড়ছে। কেউ সম্যক উপলব্ধিতে আনছে না। প্রকৃতি, সৃষ্টি-রহস্য, রাজনীতি, ধর্ম, কালচার, বৈচিত্র্যতা, ফ্যাশন-স্টাইল-আধুনিকতা, ট্র্যাডিশন বা মূলে ফিরে যাওয়া, সর্বজনীনতা ইত্যাদি বিষয় ভাবলে মানুষ এত অস্থির হতো না, বা উল্টাপাল্টা কমেন্ট করতে না।

পোশাক ছোট হলেই বিপরীত লিঙ্গ সিডিউসড হবে, পোশাক বড় হলে হবে না, এমন উপসংহার টানা যায় না। পোশাক পরে হোক, আর পোশাক ছাড়া হোক আর পোশাক অর্ধেক হোক, যেভাবেই নারী রাস্তায় বের হোক বা মোড়ে দাঁড়াক, পুরুষগুলোর চোখ ওদিকে যাবেই। নানানভাবে সন্তর্পণে দেখবেই। ভারতীয় উপমহাদেশের পুরুষেরা চোখ থামিয়ে রাখতে পারে না। তাকাবেই এবং সেই তাকানো মাত্রাজ্ঞানহীনতা ছাড়ায়, দৃষ্টিকটু লাগে। কোনো

কোনো সময় তা ছোট মন্তব্য বা বেফাঁস উচ্চারণ পর্যন্ত হয়। পশ্চিমের দেশগুলোতে কি পুরুষেরা তাকায় না? হয়তো তাকায়, তবে সেই তাকানো লম্বা হয় না, দৃষ্টিকটু হয় না, শালীনতা হারায় না। আবার উল্টাভাবে, পুরুষেরা যখন অর্ধনগ্নভাবে থাকে, তখন কি নারীরা দেখে না, একটু অস্বস্তি ফিল করে না? করে। তবে শালীনতা হারায় না। মাত্র জ্ঞান হারায় না।

লোহা ও চুম্বক পাশাপাশি রাখলে আবেশিত হবেই। কে লোহা বা কে চুম্বক, নারী না পুরুষ, এ নিয়ে তর্ক বাদ দিই। পুরুষ যদি নিজেকে চুম্বক ভাবে কিংবা লোহা ভাবে, তাতে সমস্যা কমে না। আকর্ষণ ও আবেশন ঘটবেই। লোহা ও চুম্বক হলো বস্তু। মানুষ তো আর বস্তু না। মানুষের মন, বিবেক, হৃদয়, বুদ্ধি, মাত্রাজ্ঞান, শিক্ষা, রুচি, স্থান-কাল-পাত্রবোধ, ধর্ম বা প্রজ্ঞা আছে। সুতরাং মানুষ আকর্ষণ ও আবেশন বোধ করলেও কখন কোথায় কীভাবে থামতে হবে, তা জানতে হবে। হোক সে নারী কিংবা পুরুষ। বস্তু বা পশু থেকে আলাদা হতে হবে। না হলে সে আর মানুষই থাকে না।

মানুষের নানান বিষয়ে ইচ্ছা তৈরি হয়, কষ্ট বা অনুভূতি জাগে। মানুষ তা নিয়ন্ত্রণও করে। অন্যের হাতে বেশি টাকা দেখলে, অন্যের বেশি সম্পদ দেখলে, অন্যের বড় পদ দেখলে, অন্যের সুন্দর জামা দেখলেও আমরা একটু আক্ষেপ করি। সেটা কি সিডিউস হবে? না। আমরা দেখি আবার নিজেকে বুঝিয়েও নিই যে সব পেতে হয় না, আর সব পেলে নষ্ট জীবন।

৪. কার ইচ্ছায় পোশাক পরিধান?

কে কী পরবে তা নিজেই ঠিক করবে? নাকি অন্যরা? পুরুষ কী পরবে, তা নারী ঠিক করবে? নাকি করবে না। আর নারী কী পরবে, তা পুরুষ ঠিক করবে? নাকি করবে না। সাধারণত আমরা লজ্জা নিবারণের জন্য বা আবহাওয়া বুঝে মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে পোশাক পরি। কিন্তু পোশাকের ধরন স্টাইল, ফ্যাশন ইত্যাদি ঠিক করি অন্যদের কথা ভেবে। আমি যে বিশ্বে বাস করি, যে সমাজে থাকি, যে বান্ধব-কলিগ-প্রতিবেশী-স্বজনদের সাথে দেখা হবে, তাদের কথা ভেবে আমরা পোশাক ঠিক করি। তার মানে আমরা যখন বলি যে "আমি আমার ইচ্ছামতো যা খুশি পরব", তখনো আসলে আমরা নিজের ইচ্ছামতো পরি না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, মগজ-মনন স্টাইল ও ফ্যাশন ঠিক করে। সেই মনন আবার প্রভাবিত হয় বিশ্ব কালচার, লোকাল কালচার, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি দিয়ে। সুতরাং স্বাধীন হতে

গিয়েও আমরা স্বাধীন হতে পারি না। কেউ অধীন হয় পশ্চিমার, কেউ অধীন হয় ধর্মের, কেউ অধীন হয় পূর্বের, কেউ অধীন হয় অধর্মের, কেউ অধীন হয় কালচারের আর কেউ হয় বৈশ্বিক বা লোকাল। সুতরাং আমরা যখন নিজের ইচ্ছামতো জামা পরি, তখনো পরিবেশ-প্রতিবেশ-সমাজ প্রভাবিত করে। স্বাধীন হয়েও আমরা স্বাধীন হতে পারি না।

৫. পোশাক-নুইসেন্স!

পোশাক ছোট পরলে পাবলিক নুইসেন্স হয়, নাকি পোশাক বড় পরলে? নুইসেন্স হওয়াটা আপেক্ষিক। কে উপদ্রব অনুভব করে, কোথায় করে, কেন করে ইত্যাদি প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। একজন এক দেশে গিয়ে ছোট পোশাকের মানুষদের দেখলে উপদ্রব অনুভব করবে, অন্যজন অন্য দেশে, স্থানে, প্রতিষ্ঠানে, অনুষ্ঠানে, ঘরে গিয়ে বড় পোশাক দেখে উপদ্রব অনুভব করবে। তাই বলা যায় নুইসেন্স হয়, এটা সত্য। তবে কেন হয়, কে হয়, কোথায় হয়, কী কারণে হয় সেটা ভিন্নতর। আমার কাছে যা সাদা, আরেকজনের কাছে তা সাদা না-ও হতে পারে। আবার পোশাক ছোটর মধ্যেও নানান শালীন পোশাক আছে। আবার বোরখা, নেকাব বা লং কুর্তা পরার মধ্যেও নানান অশালীন পোশাক আছে। শালীনতা নির্ভর করছে যিনি পরছেন তিনি কীভাবে পরছেন, কী উদ্দেশ্যে পরছেন, তার উপর। আবার যিনি দেখছেন তিনি কীভাবে দেখছেন, কী মনন নিয়ে দেখছেন, তার উপর।

নারীরা ছোট পোশাক পরলে যদি পুরুষেরা সিডিউসড হয়, তাহলে পুরুষরা যে লুঙ্গি কাছা দেয়, হাফ প্যান্ট পরে, শরীর খালি রেখে হাঁটে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হিসু করে তার বেলায়? নারীর খোলাবদন যদি পুরুষের অস্বস্তির কারণ হয়, পুরুষের খোলাবদনে নারীরা অস্বস্তি অনুভব করেন না? বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ছোট-বড় বিষয় না। যেকোনো পোশাকেই যে কেউ সিডিউসড হতে পারে। যদি মন ও মগজ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে সিডিউসড হবে। বিপরীত লিংঙ্গের কাউকে দেখলে হালকা ক্ষণিকের আকর্ষণ তৈরি হতেও পারে না-ও পারে। আকর্ষণ আর সিডিউস তো এক বিষয় না। সুতরাং যার পোশাক তার চাইতেও যিনি দেখে সিডিউসড হন, তার রুচি, মনন, শিক্ষা, প্রজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা তথা মানুষ হিসেবে কতটা ব্যালান্সড, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

৬. বোরখা ও নেকাব

বাংলাদেশে মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও বাংলাদেশের ৫০ বছর পেরিয়ে পোশাকের বহুবিদ বিবর্তন ঘটেছে। এখন নারীদের পোশাক দেখলে প্রায় সবখানে বোরখা পরা বা নেকাব পরা নারী বেশি দেখা যাবে। আমি যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম, তখন পুরো ক্লাসে এক দুইজন পরত বোরখা। আর এখন প্রায় সবাই পরে। কেন দেশে ধর্ম বেড়েছে? নাকি মানুষ ধর্ম মেনে বোরখা পরে? হতে পারে অনেকেই হয়তো ধর্ম মেনে পরে। তবে অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে যে পাবলিক প্লেসে প্রেম করতে ও পরিচিতি লুকাতে বোরখার ব্যবহার বেড়েছে। আর আরেকটা কারণ হলো সামাজিক মন্তব্য। কেউ বোরখা বা নেকাব না পরলে সমাজ বা প্রতিবেশী বা কলিগ বা সহপাঠীরা কমেন্ট করে। সেই সব কমেন্ট অনেক কিশোরী সহজে নিতে পারে না। তাই স্রোতে গা ভাসায়। অনেকে বলে যে বোরখা, নেকার বেশি পরলে বা ঢেকে রাখলে রেইপ বা টিজিং কম হবে। গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে বোরখা বা নেকাব পরা বেড়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় রেপ, টিজিং, বুলিং কমেনি। সুতরাং মানুষের মানসিক পরিবর্তন না হলে, সত্যিকার শিক্ষিত না হলে, প্রকৃত ধার্মিক না হলে, প্রকৃত সংস্কৃতবান না হলে এসব অঘটন কমবে না। কেবল পোশাক কোনো বড় সমস্যা না।

আবার উল্টা যুক্তিও আছে যে পর্দা করলে অপরাধ কম ঘটে। যেমন একটি ঘটনার কথা বলি। একবার এক নারীকে টাইট হিজাব ছাড়া বোরকা পরিয়ে ইরানের শিরাজ শহরের ব্যস্ত রাস্তায় রাখা হলো। সেই সোমবারে ১০০০ গাড়ি পাস করার কালে ২১৪ জন ড্রাইভার তাকে এসে লিফট দিতে চাইল। এর পরের সোমবারে একই মহিলাকে একই জায়গায় আবার দাঁড় করানো হলো। এবার বোরকার সাথে চাদর, ভালোভাবে ঢাকা শরীর। দেখা গেল ১০০০ গাড়ি পাস করে যাবার কালে ৩৯ জন ড্রাইভার এসে মহিলাকে লিফট দিতে চাইল।

কিন্তু একই ঘটনা ইউরোপে ঘটালে আরেক রকম ফল হবে। ফ্রান্সে বোরখা পরে এ রকম দাঁড়ালে আক্রমণের শিকারও হতে পারে। সুতরাং পোশাক একটা ফ্যাক্টর, অন্য ফ্যাক্টরও আছে। যেটা অহরহ সামনে পড়ে সেটার দিকে মানুষ তাকায় না। ইউরোপের সবাই যেহেতু ছোট ড্রেস পরে, তাই সেখানে এটা সবার চোখে সয়ে গেছে। বরং বড় কাপড় পরলেই তাদের চোখে পড়ে। যেমন ফ্রান্সে বোরখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার বাংলাদেশে প্রায় সবাই লং ড্রেস পরে বা পুরো শরীর ঢেকে রাখে। এখানে কেউ ছোট ড্রেস পরলেই সবাই

তাকিয়ে থাকে। ব্যতিক্রমটা মানুষের চোখে পড়ে, এটাই স্বাভাবিক। একটি দেশের রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, রুচি, শিক্ষার ধরন–সব ঠিক রেখে কেবল পোশাক পাল্টে ফেলা যাবে না। ইউরোপেও না, বাংলাদেশেও না। অন্যান্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পোশাকও পরিবর্তন হয়। বিশ্বায়নও প্রভাব ফেলে।

৭. পোশাক ও ধর্ম

প্রতিটি ধর্মেই পোশাক নিয়ে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। দেহ ঢাকার বিষয়টা নানানভাবে বলা হয়েছে। আবার অন্যের দিকে তাকানোর বিষয়েও সংযত হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। তা ছাড়া আমাদের শিক্ষা, মূল্যবোধ, সচেতনতা, আত্মোপলব্ধি ও সংযম আমাদের পোশাক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। যে ধর্ম মানবে সে ধর্মমতে পোশাক পরবে, যে ধর্ম মানবে না সে তার নিজস্ব শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী পরবে। যে দেশ, সমাজ বা সংস্কৃতি মানবে সে সেই অনুযায়ী পোশাক পরিধান করবে। এ নিয়ে কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে কঠোর সমালোচনা করার সুযোগ নেই। আবার জোর করারও সুযোগ নেই।

অনেকে দাবি করে, ছোট পোশাক পরলেই অধার্মিক বা নাস্তিক বা কম ধার্মিক। আবার অনেকে মনে করে ধর্মীয় পোশাক পরলেই কেউ উগ্রবাদী। বিষয়টা এত সহজীকরণ করা ঠিক না। টুপি-পাঞ্জাবি পরলে, দাড়ি রাখলে কেউ উগ্র হয় না, বোরখা পরলেই কেউ উগ্র হয় না বা ধার্মিক হয় না। আবার ছোট পোশাক পরলেই কেউ নাস্তিক বা কম ধার্মিক না। প্রয়োজন, ত্বক সেনসিটিভিটি, নিজস্ব রুচি ও শিক্ষা, বিশ্বাসের ধরন, পারিবারিক ও সামাজিক আবহ, প্রতিবেশী ও স্বজনদের প্রভাব নানান কারণে মানুষ পোশাক বাছাই করে। আবার হতে পারে প্রত্যেকের নিজস্ব দর্শন রয়েছে। তবে যারা পোশাক দেখে মানুষকে নাস্তিক বা ধর্মীয় উগ্রতার লেবাস দিয়ে দেয়, তাদের রাজনৈতিক ধান্ধা আছে। এটা সমীচীন নয়।

৮. পোশাক ও বিদেশী সংস্কৃতি!

অনেকে বলেন বিদেশী সংস্কৃতি অনুসরণ করব না। এটা ভালো দিক। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে যে পোশাক আমাদের ছিল তা আর আমরা পরি না। মুসলিম শাসন, মোঘল আমল, ব্রিটিশ আমল আমাদেরকে নানান প্রভাবক দিয়ে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং আমরা যা পরি এখন তা বিদেশী সংস্কৃতি দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। ধর্মীয়গুলোও এসেছে বিদেশ থেকে, অধর্মীয়গুলোও এসেছে বিদেশ থেকে। যে

বিশ্বে বা পৃথিবীতে বাস করি তার ছোঁয়া আমাদের গায়ে লাগবেই। তা ধর্ম হোক, আবহাওয়া হোক, কালচার হোক আর আধুনিকতা হোক। বৈশ্বিক প্রভাব থেকে আমরা বের হতে পারব না। আমরা সবাই এখন মাস্ক পরি, এটা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সকলেই গ্রহণ করেছে। তাই ছোট পোশাক বিদেশ সংস্কৃতি থেকে আমদানি নাকি বড় পোশাক বিদেশি সংস্কৃতি—এসব কুতর্ক এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াতে দেখেছি যে পাবলিক প্লেসে বা ফরমাল অনুষ্ঠানে সবাই নানান ধরনের জামা পরলেও একটা মিনিমাম সভ্যতা মেনে জামাকাপড় পরিধান করেই যায়। তবে দু-চারজন যে উল্টাপাল্টা জামা পরে যায় না, তা নয়। তবে এ নিয়ে কেউ কোনো মন্তব্য করে না। দৃষ্টিকটুভাবে তাকিয়ে থাকে না। তবে যেটা হয় সেটা হলো, পোশাক দেখে আপনি বুঝতে পারবেন, কার রুচি ও ব্যাকগ্রাউন্ড কী রকম। ওইটুকুই যথেষ্ট। কাউকে জোর করে কোনো পোশাক পরার দাবি করা যাবে না। আবার কোনো পোশাক না পরার কথাও বলা যাবে না। ছোট পোশাক যেমন একজন মানুষ পরতে পারে, তেমনি বড় পোশাকও পরতে পারে। যেকোনো মানুষ তার ধর্মীয় পোশাক, নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক, পারিবারিক পোশাক, রাজকীয় পোশাক, ভিন্ন সংস্কৃতির পোশাক পরতে পারে। তা ছোট সাইজের হোক আর বড় সাইজের হোক, সেটা সমস্যা না।

৯.

গত কয়েক বছর ধরে ছেলেদের লুজ প্যান্ট পরা আর হিপের অংশবিশেষ দেখা যাওয়া নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। হিপের অংশ দেখা যাওয়া কোনো বিষয় না, বিষয় হলো গিয়ে ওসব ছেলেরা মাঝেমধ্যে প্যান্ট টেনে উপরে তোলার চেষ্টা করে।লুজ প্যান্ট পরবে আবার হিপের অংশ দেখা যাক তা চাইবে না! তা হওয়া উচিত না। ঢাকতে চেষ্টা করাটা দৃষ্টিকটু। গত কয়েক দিন ধরে ওড়না নিয়ে ফেসবুক গরম হয়েছে। ও তে ওড়না দিয়ে বাক্য দিয়েছে পাঠ্যবইয়ে। ওড়না পরতে চাই। এতে আমি দোষের কিছু দেখি না। ওড়না না পরতে চাওয়া যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা, তেমনি ওড়না পরতে চাওয়াও স্বাধীনতা। ভদ্রমহিলাদের অনেককে দেখা যায় টাইট জামা, শর্টস, স্বচ্ছ ওড়না পরেন। যার যার পছন্দ। ব্যক্তিস্বাধীনতায় কেউ চাইলে বোরখা পরতে পারেন। আবার কেউ স্বল্পবসনে সংক্ষেপে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। যার যা খুশি পরতেই পারেন। এটা সমস্যা না। সমস্যা হলো গিয়ে এসব পরার পর আবার নিজেই হালকা ঢাকার চেষ্টা করেন। বারবার, দৃষ্টিকটুভাবে। এমনিতে হয়তো কেউ দেখছে না, কিন্তু যখন বারবার

ঢাকার চেষ্টা বা অভিনয় করেন, তখন ব্যাপারটা বেখাপ্পা হয়ে যায়। এ নিয়ে কৌতুক করে লেখা–

"শর্ট পরে, টাইট পরে
সব স্বাধীনতা।
এই নিয়ে ঠিক নহে
কোনো কথা বলা
পরবে যদি পরুক তবে
মনের সহিত বোঝে
পরিবার পরে কেন তবে
ঢাকার বাহানা করে?"

১০.

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার একটা লেখা লিখেছে শাড়ি নিয়ে *প্রথম আলোতে*। এ নিয়ে অনেকে সমালোচনা করছেন। আমার ভাবনা এ রকম:

ক) বিষয়টা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে, সেটার উপর নির্ভর করছে এটা ভালো না মন্দ লেখা। প্রত্যেক মানুষই (পুরুষ বা নারী) নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে চায়। পরিপাটি হয়ে বা সুন্দর পোশাকে যাতে তাকে খুব আকর্ষণীয় লাগে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লেখাটি ভালো লেখা। আমি সে দৃষ্টি নিয়েই পড়লাম।

আর নারীমাত্রই কেবল শরীরের ঢেউ দেখানো পোশাক পরতে হবে, এমন দৃষ্টি থেকে লেখা হলে বা ভাবা হলে তা নিশ্চয়ই মন্দ। সেটার সঙ্গে কোনো সুস্থ মানুষ সহমত হবে না।

যা-ই হোক, আমি নারী হলে প্রতিদিন শাড়ি পরতাম। যাতে আমায় বেশি সুন্দর দেখায়, তা মিস করার লোক আমি না।

বুঝলে বুঝপাতা না বুঝলে তেজপাতা।

খ) 'সুন্দর হবার জন্য শাড়ি পরতেই হবে স্বামী বা সমাজ বা অফিসের চাপে' বনাম 'আমি নারী, আমারে শাড়িতে ভালো লাগে তাই শাড়ি পরি'–দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য। আবার 'চাকুরি করা যাবে না স্বামী, সমাজ বা ধর্মীয় চাপে বনাম 'আমার ভালো লাগে তাই আমি চাকুরি না করে স্বাধীন কাজ করি বা ঘরে বসে গৃহিণী হয়ে কাটাই'–দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য।

রাত দিন এ পার্থক্যটা অনেকে খুব খেয়াল করে না। যে কারণে অনেকেই

'শাড়ি পরে মানেই শরীর দেখানোর জন্য পরে বা বাধ্য হয়ে পরে' কিংবা 'চাকুরি করে না মানেই যোগ্যতা নেই বা পরিবার চাকুরি করতে দেয় না'—এমন অতি সাধারণীকরণ উপসংহার টানে।

এ কারণে স্থান-কাল-পাত্র-পরিপ্রেক্ষিত ও যে করছে তার নিয়ত কী সেটা জরুরি।

গ) জেন্ডার বিষয়ে মাস্টার্সের কোর্স করেছিলাম জাপানের কোবে ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে আমেরিকান প্রফেসরের অনেক অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক আলোচনা শুনেছি, পড়েছি অনেক আলোচিত লেখা ও বই। ২৫টি দেশের নানা রকম জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনের উপর শেয়ার করেছে ক্লাসের বন্ধুরা। দিয়েছে শত শত বিচিত্র উদাহরণ বৈষম্যের। ছিল ফিল্ডওয়ার্ক ও থিসিস লেখা।

আর বাংলার মাঠে-ঘাটে তো কাজের অভিজ্ঞতা আছেই। সেসব মাথায় রেখেই বলছি:

ঘ) শুধু শাড়িই নয়, লুঙ্গিসহ তামাম পৃথিবীর সকল শৈল্পিক ও ট্র্যাডিশনাল পোশাকের জয় হোক। যার ভালো লাগে পরবে ও যে পরবে তারে সকলে আকর্ষণীয় বলবে, এটাই আজকের স্লোগান। জেন্ডার-ফেন্ডার ফাউ আলাপ।

ঙ) সায়্যীদ স্যার যৌন আবেদনময়ী বলাতে দোষ হইসে বুঝলাম; সমালোচনাকারীদের মধ্যে কে আছে এমন যে যৌন আবেদনময়ী হতে চায়না? ঠগ বাছতে গা উজাড় হবে কিন্তু!

চ) যার ইচ্ছা শাড়ি পরবে, যার ইচ্ছা পরবে না; এ নিয়ে জোর করা চলবে না। জেন্ডার ইস্যু বিবেচ্য। (অফ টপিক: ভালা জিনিস না পরলে কী আর করা!)

ছ) যে কাজ পারে সে শাড়ি পরেও ঘরে-বাইরে সব কাজ করে।

যে কাজ পারে না, সে শাড়ি না পরেও পারে না। শাড়ি একটি সুন্দর শৈল্পিক পোশাক।

শাড়ির জয় হোক, তথা ট্র্যাডিশনাল সকল সুন্দর পোশাকের জয় হোক, আর সব নিপাত যাক।

১১. এখন করণীয় কী?

প্রথমত: মানুষ তার নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি, কমনসেন্স, মাত্রাজ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস, কালচারাল মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে যা খুশি পরুক। এ নিয়ে কোনো উগ্র সমালোচনা করা যাবে না। আক্রমণ তো নয়ই।

দ্বিতীয়ত: যেহেতু আমদের স্থান-কাল-পাত্রভেদে পোশাকের ভিন্নতা হয়, সেহেতু সব জায়গায় সব পোশাক পরে যাব না। যে পোশাক পরে ঘুমাতে যাই সে পোশাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাই না। যে পোশাক পরে অফিস-আদালতে যাই, সে পোশাক পরে বন্ধুর বাড়িতে যাই না। ফ্যাশন স্টাইলের জ্ঞান যেমন থাকবে, অ্যাস্থেটিক সেন্স যেমন থাকবে, তেমনি কার সামনে কোথায় কখন যাচ্ছি, সে জ্ঞানও থাকা লাগবে। যাতে করে গণমানুষ বিরক্তবোধ না করে।

তৃতীয়ত: বিপরীত লিঙ্গের যে যা-ই পরুক না কেন, তা নিয়ে অযথা মনোযোগ দেব না। যদি কোনো পোশাক সিডিউস, আকর্ষণ, আবেশন তৈরির মতোও হয়, সেটাও ক্ষণিকের মধ্যেই নিজের মাথা থেকে সরিয়ে নিজের জগতে নিজের কাজে থাকব। যার পোশাক সেটা তার পোশাক, সেটা তার সুবিধা বা সমস্যা। তারটা নিয়ে আমাদের এত নাক গলানোর কিছু নেই।

চতুর্থত: যদি কেউ সমাজ, ধর্ম বা কালচারাল মূল্যবোধের বাইরে গিয়ে কিছু পরিধান করে, তবে সেটা নিয়ে সরাসরি আক্রমণ করা যাবে না, এমনকি কড়া সমালোচনা করা যাবে না, হেয় করে কিছু বলা যাবে না। তবে একাডেমিক আলাপ বা রাজনৈতিক আলাপ হিসেবে যথাযথ পরিবেশে পরিমিত ভাষায় তার সমালোচনা বা নানান দিক নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। সেই আলাপ যেন হয় সমাজ পরিবর্তনের, উন্নয়নের, সভ্যতার। কোনোভাবেই যেন আমাদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে না যায়।

পঞ্চমত: কেউ যদি ধর্ম বা রাজনীতি বা কালচারাল মূল্যবোধ থেকে পোশাক বিষয়ে কোনো একাডেমিক আলোচনা বা অ্যাকটিভিজম করে বা দাবিদাওয়া করে, সেটা করার অধিকারও তার আছে। যতক্ষণ না তা দ্বারা অন্য কারও উপর আক্রমণ হয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জাতির প্রতি হেয়মূলক কিছু না হয় সে রকম দাবি কেউ করতে পারে। ধার্মিকেরা তার ধর্মের পোশাকের কথা বলতে পারে, একটি জাতি তার জাতীয় পোশাকের পক্ষে বলতে পারে। একটি সংস্কৃতির লোক তাদের সংস্কৃতির পোশাকের পক্ষে বলতে পারে। গণমানুষও তাদের দাবি গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। সেই অধিকার বা সুযোগ মানুষের আছে ও থাকবে।

আরামের পোশাক পরি, আরামে থাকি। শরীরের আরাম, চোখের আরাম আর মনের আরাম হয়, এমন পোশাক পরব। আর সবার সাথে এমন কথা বলবো যেন কেবল সবার মনে আরাম হয়, এমনভাবে তাকাব যেন আরাম লাগে। আরাম আরাম আর আরাম।

পাহাড়ি-বাঙালি বিবাদে বিবেচ্য বিষয়াদি কী?

সম্প্রতি পাহাড়ের ঘটনায় অনেক নতুন পাঠক ও ফেসবুক ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত মনে হয়েছে। বিশেষ করে অনেক প্রাজ্ঞ লোককে পক্ষে-বিপক্ষে নানান কথা বলতে শুনেছি। আমি মনে করি পার্বত্য অঞ্চলের হাজার বছরের ইতিহাস জেনে, প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইভল্যুউশন ও বিস্তার জেনে, মোগল-ব্রিটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ আমলের পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তারিত ইতিহাস জেনে, সেখানে শান্তিচুক্তির আগে ও পরে গঠিত নানান স্থানীয় সংগঠনগুলো কার্যক্রম বুঝে, বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর শুরু থেকে অদ্যাবধি সকল কাজ দেখে ও বিশ্লেষণ করে আর সেখানে যাওয়া বাঙালিদের বাস্তবতা বুঝে তারপর উপসংহার টানা উচিত। অন্যথায় বিচ্ছিন্ন গল্প বা উপসংহারমূলক বক্তব্য ভুল মেসেজ দেবে।

যারা একেবারে নতুন বা জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য আমার এ বিস্তারিত পোস্ট। আমি কোনো উপসংহার টানিনি। যেসব বক্তব্য পক্ষে-বিপক্ষে প্রচলিত আছে, তা তুলে ধরেছি। পাঠকেরা এটা পড়ার পরে আরও অন্যান্য সোর্স পড়ে নিজের বোঝাপড়া নিজে করবেন। তবে আমার লেখা থেকে পাঠক প্রাথমিক একটা ধারণা পাবেন। এটা নিশ্চিত।

পাহাড়ি নাকি উপজাতি নাকি আদিবাসী?

পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা আগে থেকে বাস করেন, তাদেরকে কেউ ডাকে পাহাড়ি, কেউ ডাকে উপজাতি, কেউ ডাকে আদিবাসী আর কেউ ডাকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। অনেকে মনে করেন তারা যেহেতু পাহাড়ে বাস করে, তাই তারা পাহাড়ি। বিভিন্ন উপজাতির লোকজন বাস করেন, তাই উপজাতি ডাকাও যৌক্তিক। তবে আদিবাসী ডাক নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যারা ওখানে বাস করেন তারা মনে করেন তারা আদিবাসী। নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে তাদেরকে আদিবাসী বলে দাবি করেন। আবার, বাঙালি বা নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ তাদেরকে আদিবাসী মানতে নারাজ। কারণ, তাঁরা সেখানে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের

মতো হাজার বছর ধরে বাস করছেন না। তারাও ৫০০-৭০০ বছর আগে মোগল আমলে বা আগে-পরে মায়ানমার, ভারত বা অন্য কোথাও থেকে এখানে এসেছে। আইএলওর উপজাতির সংজ্ঞা ও আদিবাসীর সংজ্ঞা দেখলেও এমনটাই হওয়ার কথা। তাই তাদেরকে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলা যেতে পারে। আদিবাসী নয়। সরকারও তাদেরকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলেই লিখিতভাবে পরিচয় দেয়। তবে আমি মনে করি, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে পাহাড়িরা যেভাবে চায়, সেভাবে তারা নিজেদের ডাকুক। সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা তাদের ডাকতে পারি।

বাঙালি নাকি বাংলাদেশি নাকি সেটেলার?

বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করছে জেনারেশনের পর জেনারেশন। তবু ওখানকার পাহাড়িরা বাঙালিদেরকে সেটেলার ডাকে। এই সেটেলার ডাক নিয়ে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু বাঙালিদের বেশির ভাগ কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম থেকে এসেছে, সেনাবাহিনী বা সরকারের সহায়তায় আশির দশকে অনেকে এসে সেটেল হয়েছে, তাই তাদেরকে সেটেলার বলাই সমীচীন। যাদের ঘরবাড়ি নেই বা বিভিন্ন মামলার আসামি বা গরিব এমন লোকেরাই সেখানে গিয়ে সেটেল করেছে। তাই তাদেরকে সেটেলার ডাকাই যৌক্তিক। আর বাঙালিদের বক্তব্য হলো, বাঙালিরা দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যায়নি। নিজ দেশেরই আরেকটি জেলায় গিয়েছে। দেশের অন্য জেলায় গিয়ে যখন জমি কিনে বা জমি বরাদ্দ নিয়ে পাহাড়িরা বাস করেন, তখন কি তাঁদেরকে সেটেলার বলা হয়? যার কোনো জমি ছিল না, পিতৃভূমি নেই, নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে সেটেল হলে তাদেরকে সেটেলার বলা যেতে পারে। বাঙালিরা বাংলাদেশেরই আরেকটি জেলায় গিয়ে জমি কিনে বা বরাদ্দ পেয়ে আইন মেনে বসবাস করছে। তাদেরকে আলাদা নামে ডাকার কোনো সুযোগ নেই। কেবল বাঙালি বা বাংলাদেশিই তার পরিচয় হতে পারে। দুই গ্রুপের পক্ষেই হাজার হোর যুক্তি, যত শুনবেন ততই মজা। সব শোনার পরে আপনি কার পক্ষ নেবেন, সেটা ভাবতে গেলে মাথা আউলাবে।

জমি কেনার অধিকার বাঙালিদের আছে কিনা?

জমি কিনতে পারে কি না? এ প্রশ্নে নানান মত রয়েছে। পাহাড়িরা মনে করে এটা তাদের ভূমি। সেখানে অন্যরা না যাওয়াই সমীচীন। গেলেও আইনানুগভাবে

যাবে এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও পরিবেশ-প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি করবে না এ রকমভাবে যেতে পারে। জোর করে জমি দখল নেওয়া যাবে না। আর বাঙালিরা মনে করে, সারা দেশের ন্যায় পাহাড়েও তাদের জমি কেনার অধিকার আছে। এ বিষয়ে ইতিহাস ঘাঁটলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। তবে সংক্ষেপে বললে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মোগলরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে। তাদের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের কর্তৃত্ব পায় বাংলার নবাবরা। ১৭৬০ সালে নবাব মির কাশেম আলী পার্বত্য চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। তখন চাকমারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল, তবে পরে হার মানে। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৯০০ সালে তারা জারি করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অ্যাক্ট'। তাতে সেখানে বসবাসরত পাহাড়িদের অধিকার ও স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ওই আইনে 'অ-উপজাতিদের' সেখানে জমি কেনা নিষিদ্ধ করা হয়। তবে জেলা প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে জমি হস্তান্তরের পদ্ধতি বহাল ছিল। কোনো 'অ-উপজাতি'র ওই অঞ্চলে যেতেও জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিতে হতো। সেটা এখনো মানা হয়। কাগজে-কলমে তা আছেও। তবে বাস্তবে অনেক অনিয়ম বা জবরদস্তি হয়তো ঘটে, যে কারণে উত্তেজনা বাড়ে।

মূলত ভূমি নিয়েই দ্বন্দ্ব চরমে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তিতে ব্রিটিশআমলের মতোই যুক্ত করা হয়েছে, পার্বত্যাঞ্চলে ভূমি কেনাবেচা, হস্তান্তর স্থানীয় পরিষদের অনুমোদন ছাড়া করা যাবে না। এর বিরোধিতা করছে বাঙালিদের সম-অধিকার আন্দোলন। মেজবাহ কামাল বলেন, "পাহাড়ি-বাঙালি দ্বন্দ্ব অনেক পুরোনো, সেটা আমি মনে করি না। বাঙালিদের তো একসময় পাহাড়িরাই আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন, জমি চাষাবাদের প্রয়োজনে। সম্পর্কটা সুসম্পর্কই ছিল। এখনও যে জমিটা পাহাড়ের মানুষের হাতে আছে, সেটা যেন তাদের হাতে থাকে এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে পরিসরটুকু দরকার, সেটা যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিয়ন্ত্রণ বলতে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি, সেখানে যেন অন্যদের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই তো আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত সীমানা আছে।"

বাঙালিদের সরিয়ে নেওয়ার যে দাবি পাহাড়িরা করে আসছে, তা হয়তো সমীচীন নয়। বাঙালিদের সেখানে যাওয়ার ও জমি ক্রয়ের অধিকার থাকা উচিত। তবে কোনোভাবেই পাহাড়িদের নিজস্ব জমি, চাষ বা সংস্কৃতির ক্ষতি করা যাবে

না। সে বিষয়ে মেজবাহ কামাল বলেন, "এই দাবি পাহাড়িরা কেন করেন, সেটা তো বুঝতে হবে। কারণ, তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছে। সেখানে কিন্তু মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমি সমতলের চেয়ে কম। ফলে তাদের তো বাঁচতে হবে। তাদের পেটে লাথি মেরে তো আমরা সেখানে কর্তৃত্ব করতে পারব না। আমরা সেখানে সকল জাতিসত্তার সমানাধিকার নিশ্চিত করতে পারছি না। আমরা এখনো এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারছি না। মনোকালচারের জায়গায় যদি মাল্টিকালচারাল রাষ্ট্র করা যায়, একটা বহুজাতির রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং স্থানীয় মানুষের জমি, জল, জঙ্গলের উপর অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে আমি মনে করি সম্প্রীতির আবহ গড়ে উঠবে। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সমমর্যাদায় বাস করতে পারব এবং এই নিশ্চয়তাটুকু পেলেই পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।"

জাতীয় ইতিহাস কী বলে?

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অনেকে অস্ত্র হাতে অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ইউ কে চিং মারমা যুদ্ধে বীরত্বের জন্য বীর বিক্রম খেতাবও পেয়েছিলেন। তবে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়সহ একটি অংশ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল তখন।

স্বাধীনতার পর পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য চেতনার বিস্তার ঘটেছিল। তখন জুম্মু জাতিগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা)। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)। বাংলাদেশের সংবিধান চূড়ান্ত করবার সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি অ-উপজাতীয়দের সেখানে থাকা নিষিদ্ধ করার দাবিও জানান তিনি। সংসদে বক্তব্যে তিনি পাহাড়ি জনগণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

কিন্তু এম এন লারমার দাবিতে সরকার কর্ণপাত করেনি। উল্টো ১৯৭৩ সালে পার্বত্যাঞ্চলে নিরাপত্তার কথা বলে প্রথম সামরিক ক্যাম্প বসানো হয়। তার প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে জেএসএসের সামরিক শাখা শান্তি বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিলেন এম এন লারমার ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)।

আনু মুহাম্মদ লিখেছেন, "আশির দশকে সামরিক শাসন শুরুর পর পাহাড়ি জনগণের প্রতি রাজনৈতিক অস্বীকৃতি রূপ নেয় সামরিক শাসনে। সরকারিভাবে

উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দরিদ্র বাঙালিদের অর্থ ও জমি দেওয়া হবে, এ রকম সুবিধা দেখিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে পুনর্বাসিত করবার কাজও চলে ব্যাপকভাবে। হাজার হাজার পরিবার পাহাড়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।"

১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ আমলে শান্তিচুক্তি হয়। শান্তিচুক্তির পর পাহাড়িদের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে দেখা দেয় বিভেদ। তাতে জনসংহতি সমিতি ভেঙে গড়ে ওঠে আরেকটি দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)। এই দুই সংগঠন আবার ভেঙে যায়। এখন পাহাড়িদের চারটি সংগঠন সক্রিয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। চারটি দল থাকলেও তারা দুই ভাগে বিভক্ত। চুক্তির পক্ষের সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) এবং চুক্তিবিরোধী প্রসীত খীসার নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এখন এক হয়ে কাজ করছে। সুধাসিন্ধু খীসার নেতৃত্বাধীন জেএসএস (এমএন লারমা) এবং শ্যামল কান্তি চাকমার নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) এক হয়ে কাজ করছে বলে এলাকাবাসী মনে করে। পাহাড়িদের অনেকেই মনে করেন, এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব না থাকলে পাহাড়ে এত গোলযোগ, সমস্যা, চাঁদাবাজি, জিম্মি ও খুনের ঘটনা ঘটত না।

তাহলে পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে লাভ কী হয়েছে? শান্তিচুক্তি হয়েছে বলেই তো রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যে সহিংসতা, সেটা বন্ধ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা গেছে। সমতলের মানুষের জন্য সেখানে চলাচল অবারিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদ গড়ে উঠেছে।

উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পাহাড়িদের অনেকেই কাপ্তাই বাঁধ চায়নি। এর কারণে হাজার হাজার মানুষের ফসলি জমি বা বসত নষ্ট হয়েছে। অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যা হয়, তাতে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়। এক পক্ষ এসব উন্নয়ন ও আধুনিকতা চায়। অন্য পক্ষ রাস্তাঘাট বা অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প চায় না। সুতরাং বিরোধ দিনে দিনে বাড়তেই থাকে।

সেনাবাহিনী পাহাড়ে দরকার আছে কি না?

এটা নিয়েও অনেক বিতর্ক হয়। কেউ বলে পাহাড়ে সেনাবাহিনী প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে তারা সেখানে নিজেদের মতো থাকবে। কেউ তাদের বিরক্ত করবে না। শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করবে। তাদের মতে সেনাবাহিনী আরও বাড়তি সমস্যা তৈরি করে বা ভয় তৈরি করে। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়।

আবার অন্য পক্ষ মনে করে সেনাবাহিনী প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে পাহাড়ি বাঙালি সংঘর্ষ ছাড়াও সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। জিওপলিটিকসের বিষয় রয়েছে। পাহাড়ের গহিন ভিতরে সিভিল পুলিশের পক্ষে অনেক সময় যাওয়া সম্ভব হয় না। সেখানে আইনশৃঙ্খলা, মাদক, অস্ত্র, পাহাড়ি ৪টি বাহিনীর মধ্যে আন্তকোন্দল থেকে পাহাড়কে মুক্ত রাখতে হলে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে। আমার মনে হয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা বাহিনীর। সে জন্য কোথায় ঘাঁটি গাড়তে হবে, সেটি নির্ধারণ করার দায়িত্বটা রাজনৈতিকের চেয়ে সামরিক নীতির অংশ বলেই মানি। সে হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থাকবে কিনা, সে সিদ্ধান্তটা আসলে সামরিক কৌশল ঠিক করা লোকদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

গুজব ও বাস্তবতা

সিঙ্গেল স্টরি শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা যাবে না। বাঙালি পরিবারের একটি কাহিনি শুনে মনে হতে পারে পাহাড়ি সবাই খারাপ। আবার পাহাড়ি একটি পরিবারের কাহিনি শুনে মনে হতে পারে বাঙালি সবাই খারাপ। এ রকম শর্টকাট উপসংহার নেওয়া যাবে না। পাহাড়িদের মধ্যে বেশির ভাগ পরিবার ভালো। তারা তাদের মতো আছে। নিজের মতো থাকতে চায়। তারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সংবিধান মানে। তাদের নিজস্ব বসবাসব্যবস্থাটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতে চায় না। বাঙালিদেরও বেশির ভাগ পরিবার ভালো। তারা যেভাবেই হোক সরকারের নির্দেশনায়, চাকুরি-ব্যবসার মাধ্যমে ওখানে গিয়ে নিয়মমাফিক বসবাস শুরু করেছে। কয়েক প্রজন্ম ওখানে বাস করছে। ওখানকার পাহাড়িদের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে। তাহলে সমস্যা কারা? দুপক্ষেই কিছু দুষ্ট লোক আছে। যারা অর্থ, অস্ত্র, রাজনীতি, ব্যবসা বা নানান সুবিধার জন্য নানান অপকর্ম করে। যখন বাঙালিদের কেউ এসব করে, তখন পাহাড়িরা সকল বাঙালিকেই গালি দেয়। আবার পাহাড়িদের কেউ যখন এসব অপকর্ম করে, তখন বাঙালিরা পাহাড়িদেরকে এসব কাজের জন্য দায়ী করে। ৫% লোকের জন্য আমরা বাকি ৯৫% লোককে কোনো লেভেল দিতে পারি না। মনে রাখতে হবে সেনাবাহিনীর মধ্যেও পাহাড়ি লোক আছে, শান্তিবাহিনীতে পাহাড়ি আছে, পাহাড়িদের মধ্যে ধনী, ব্যবসায়ী, মাদক কারবারি, রিসোর্টমালিক, গাড়ির মালিক, নানান পাওয়ারফুল লোক রয়েছে। পাহাড়ি মানেই জুম চাষ, হতদরিদ্র অসহায় নয়। আবার বাঙালিদের মধ্যেও জোর করে দখলদার, নানা

রকম ব্যবসায়ী, ধনী, মাদক কারবারি আছে। বাঙালি মানেই অসহায় ভেসে আসা ভিকটিম সেখানে নয়। কিন্তু মন্দ লোকের সংখ্যা দুপক্ষেই কম। তাদের জন্য আমরা পাহাড়ি বা বাঙালিদের সকলকে মন্দ বলতে পারি না। জমি দখলের ঘটনা অন্যান্য জেলাতেও আছে। কিন্তু পাহাড়ে জমি দখল মানেই পাহাড়ি-বাঙালি সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। সন্ত্রাসী ঘটনা অন্যান্য জেলাতেও আছে। কিন্তু পাহাড়ে সন্ত্রাসী ঘটনা মানেই পাহাড়ি বাহিনীর গ্রুপিংয়ের সমস্যা মনে করা হয়। এরকম সহজ উপসংহার টানা যাবে না। দখলকারীর কোনো জাত থাকে না, সন্ত্রাসী, মাদককারবারি কোনো নির্দিষ্ট গোত্রের হওয়া লাগে না। অন্যান্য জেলাতেও বাঙালিদের ভেতরেও ভালো, খারাপ, কুচক্রী, উপকারী, অপকারী, ধনী, গরিব, দালাল, দেশপ্রেমী ইত্যাদি পাওয়া যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও পাওয়া যাবে।

আমরা যদি শুধু সেনাবাহিনীর গল্প শুনি, তাহলে কি পুরোটা জানতে পারবো? আমরা যদি শুধু পাহাড়িদের গল্প শুনি, তাহলেও কি পুরোটা জানতে পারবো? আমরা যদি শুধু পাহাড়ের বাঙালিদের গল্প শুনি, তাহলে কি পুরোটা জানতে পারব? এই যে তিন দলে ভাগ করলাম, তার ভেতরে ধনী, গরিব, ক্ষমতাশালী, ক্ষমতাহীন, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, পক্ষীয়, নিরপেক্ষ ইত্যাদি উপদল সবার গল্প যদি না জানি, আমরা কি কোনো দিনও বুঝব আসলেই কোনটা সত্যি হতে পারে?

যে কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা সাধারণ কোনো অপরাধ হিসেবে প্রথমে ভাবা উচিত। যেটা অন্যান্য জেলাতেও ঘটে। সকল ঘটনাকে পাহাড়ি বনাম বাঙালি প্রলেপ দিলে সমস্যা বেড়ে যায়। যেকোনো অপরাধ ঘটার শুরুতে কেবল অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সমাধানে যেতে হবে। পরে যদি সেখানে পাহাড়ি-বাঙালির উপাদান পাওয়া যায়, তবে নেতৃস্থানীয়রা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দ্রুত সমাধান করতে পারে। তাতে যেকোনো সমস্যা সহজে সমাধান হবে। অন্যথায় রিউমর ও গুজব ছড়িয়ে ছোট সমস্যাকে আরও বড় করা হয়। এতে কার কী লাভ, তা স্থানীয়রা ভালো করেই বোঝে। তবে অনেক পরে বোঝে।

পাহাড়িরা কি স্বায়ত্তশাসন চায় বা জুম্মু ল্যান্ড চায়?

এটা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। বেশির ভাগ পাহাড়িই বাংলাদেশকে মানে, বিশ্বাস করে। এর সংবিধানের আলোকে আইন মেনে জীবন যাপন করে। কতিপয় পাহাড়ি হয়তো স্বায়ত্তশাসন বা জুম্মু ল্যান্ড চাইতে পারে। সেটাকে সকল

পাহাড়ির চাওয়া হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বা ইউপিডিএফ বা জনসংহতি সমিতি এ রকম কিছু সংগঠন বা তাদের সমর্থকেরা স্বায়ত্তশাসন দাবি করে আসছে। সেটা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার সতর্কভাবে দেখছে। এসব বাহিনীর দাবিগুলোকে ঠান্ডা মাথায় সরকার সমন্বয় ও সমাধান করবে। এখানে আমাদের জনসাধারণের বেশি সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই।

যা-ই হোক, পাহাড় কিংবা সমতলের মানুষ—আমরা সবাই বাংলাদেশি। এটাই আমাদের আত্মপরিচয়। ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগতভাবে আমাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে, বৈচিত্র্য আছে, এটাই আমাদের দেশের সৌন্দর্য। এ বিশ্বাস কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবারই আছে যে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বিজয় অর্জন করেছি সমতার সমাজ-রাষ্ট্র নির্মাণ করতে।

মাজার রক্ষা না মাজার ভাঙা–কোনটা যৌক্তিক?

মাজার একটি আরবি শব্দ। এটি ফারসি **দরগাহ** শব্দের প্রতিশব্দ। এর ধাতুগত অর্থ 'জিয়ারতের স্থান' বা 'দর্শনের স্থান'। এ অর্থে চিন্তা করলে সব মুমিনের কবরই 'মাজার', কেননা সব মুমিনের কবরই জিয়ারতের স্থান এবং কবরই জিয়ারত করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে মাজার বলতে সাধারণত অলি-আউলিয়া, দরবেশগণের সমাধিস্থলকে বোঝায়। আরবিভাষী বিশ্বে মাজারকে *মাকাম* বলা হয়। আবার মাজারকে রওজা বা কবরও বলা হয়। ইসলামের নবী হজরত মোহম্মদ (সা.) মদিনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকিতে এবং উহুদের যুদ্ধে শাহাঁতপ্রাপ্ত সাহাবিদের কবরস্থানে গমন করতেন এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। সুফিতত্ত্বের অনুসারীরা সুফি দরবেশদের কবরস্থান জিয়ারত করতে পছন্দ করেন। অনেক মাজারে সমাধিস্থ ব্যক্তির ওরস, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। একে ঈসালে ছওয়াবের মাহফিল বলে।

মাজারবিরোধীদের কেউ কেউ বলছেন যে, "ইসলাম ধর্মমতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ। নবী রাসূলগণও নিজেদের আল্লাহর দাস বলেছেন, নিজেরাই শিক্ষা দিয়েছেন যে 'একমাত্র' আল্লাহর ইবাদত করতে, কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাইতে, কারণ, দেবার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর কাছেই আছে। আমাদের নবীজির (সঃ) জীবনী দেখলে আমরা দেখব তাঁর চোখের সামনে এক কন্যা ফাতেমা ছাড়া বাকি সব সন্তান ইন্তেকাল করেছেন। যুদ্ধে আহত হয়েছেন, রক্ত ঝরেছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। তাঁর যাবতীয় মিরাকেল বা মুজেজার ঘটনা যা-ই আমরা শুনি, সবই হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আল্লাহর হুকুম যেখানে হয়নি, সেখানে কিছু ঘটেনি। কিন্তু আপনি বাংলাদেশের মাজারগুলোতে গেলে ভিন্নধর্মী প্রার্থনা দেখবেন। লোকজন মাজারে শায়িত

মুর্দার কাছে প্রার্থনা করছে, মানত করছে, জিকির করছে, আজগুবি কাহিনি শেয়ার করছে, সেগুলোকে বিশ্বাস করাকে ইমানি দায়িত্ব মনে করছে। অথচ আমরা জানি, ইসলাম ধর্মমতে, একজন লোক যখন মারা যায়, তার যাবতীয় ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। সে কবরে শুয়ে শুয়ে আপনার সমস্যার সমাধান করবে কীভাবে? বুদ্ধিসুদ্ধি কোথায় থাকে?

তারা আরও দাবি করছে যে, মাজার ব্যবসা বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ ব্যবসা। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বিলিয়ন টাকার নিচে কোনো হিসাব পাবেন না। শবে বরাত, শবে মেরাজ, বার্ষিক ওরস ইত্যাদি সময়ে এই ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। এসব টাকা আদায়ের সাথে স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও জড়িত। অর্থ সকল অনর্থের মূল হলে সেখানে ভালো কিছু কীভাবে হবে। ভালো বলতে একটাই ঘটনা ঘটে, তা হচ্ছে গরিব মানুষের জন্য শিরনি বিতরণ। সেটাও জনতার টাকায় এবং তা-ও এক শ টাকা দিলে হয়তো পাঁচ টাকা ব্যয় হয়। এ ছাড়া মাজার প্রাঙ্গণে মাদক নিষেধ করলে কাদের ক্ষতি হবে, সেটা বুঝতে একটু বুদ্ধি খাটানোই যথেষ্ট। এ ছাড়া এইটা একটা ফ্যাক্ট যে ভারত উপমহাদেশে এমন বহু ঘটনা আছে যে খুনের আসামি, চোর, ডাকাত ইত্যাদি পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মাজারে, শ্মশানঘাট বা মন্দিরে আত্মগোপন করে থাকে। তেমনই আমাদের দেশেও মাজারে এই ভন্ড ফকিরদের উপর অভিযান চালালে বহু ফেরারি আসামি ধরা খাবে বলে তাদের বিশ্বাস। দেহ ব্যবসা থেকে আরও বহু কিছু চলে এই সব ভণ্ডামির আড়ালে।

বিপরীতে সুফিবাদের পক্ষরা বলছেন, "তাঁরা মাজার পূজা করেন না, মাজারের কাছে কিছু চান না। মাজারের আউলিয়ার কবর জেয়ারত করেন। দোয়া করেন। যা চাওয়ার আল্লাহর কাছেই চান। শিক্ষার অভাব বা বোঝার অভাবে হয়তো কারও কারও বলার ধরন বা ভাষা ভুল হতে পারে। কিন্তু মনে মনে আল্লাহপাকের কাছেই যা চাওয়ার তা চান। তাঁরা এ-ও বলেন যে সুফিবাদ বা পীর-মাশায়েখের মাধ্যমেই এ দেশে ইসলাম এসেছে। ওনারা হচ্ছে, অলি-আউলিয়া। তাঁরা আল্লাহপাকের ও নবী করিম (সা.)-এর পথ দেখান। তাঁদের কাছে বায়াত হয়ে লাখ লাখ মানুষ মুসলিম হয়েছে। তাদের সোহবতে থাকা মানে হলো আল্লাহপাকের পথে থাকা। আলোকিত মানুষ তথা মুমিন ও আউলিয়াদের কথা শোনার মাধ্যমে আল্লাহপাকের দিদার পাওয়া সহজ হয়। মানুষ সে কারণে এসব জায়গায় যায়। যখন পীর-মাশায়েখ ইন্তেকাল করেন,

সেখানে খানকা গড়ে ওঠে। মানুষ জিয়ারত করতে যায়। তাঁদের জীবনী ও কাজ ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে শুনে শুনে আরও বেশি ধার্মিক হয়। মন নরম হয়। সুতরাং মাজারের কোনো দোষ নেই, সব দোষ মানুষের। প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। ব্যবসা কোথায় হয় না? যে দেশে মদের বার অনুমোদিত, সে দেশে মাজারের গাঞ্জা কী দোষ করল? আর কোনো প্রতিষ্ঠানে গাঁজা পাওয়া যায় না? মাদ্রাসায় কি ছাত্রদের বলাৎকার করা হয় না? মাদ্রাসায় কি ব্যবসা-বাণিজ্য হয় না? অপরাধ ঘটে বলে মাজার ভেঙে ফেলার ব্যাপারটা হচ্ছে মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার মতো। সব ধর্ম-গোত্র-জাত-পাতে কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মাজার ভাঙা, মতের সাথে অমিল হলে মানুষ হত্যা করা–এসব উচিত পন্থা না। আমরা তো আর অসভ্যতার যুগ এখন বাস করছি না। আমরা অনেক সভ্য কিন্তু কিছু মানুষের বাড়াবাড়ির আর ভুল ফতোয়ার কারণে আজ এই সব দিন দেখতে হচ্ছে।"

মাজারবিরোধীরা বলছেন যে, "রাসুল (সা.) যেখানে কবরকে উচু করতে বা এর চারপাশে উঁচু দেয়াল দিতে নিষেধ করেছেন, সেখানে সেই কবরকে কেন্দ্র করে বিল্ডিং, লাইটিং, লালসালু ইত্যাদি হাবিজাবি লাগানোর তো কোনো প্রশ্নই আসে না। এটি নিঃসন্দেহে একটি বিদাতি ও হারাম কাজ। একটি কবরকে কবর বলে মনে হওয়ার জন্য ন্যূনতম যতটুকু নির্দেশিকা প্রয়োজন বা এর সীমানা নির্ধারণের জন্য ন্যূনতম যতটুকু ঘেরা দেওয়ার প্রয়োজন, ওলামায়ে কেরাম ঠিক ততটুকুরই অনুমোদন দিয়েছেন। আর আমাদের সমাজে এই মাজারকে কেন্দ্র করে যে শিরক, বিদাত ও হারাম কাজ প্রচলিত আছে, সেগুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য। ওরস, জলসা, মানত, গান -বাজনা, নাচানাচি, লাফালাফি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা...। কোরআন-হাদিস থেকে উদ্ধৃত করে তারা দাবি করছেন যে মাজারের এসব কর্মকাণ্ড শরিয়াহবিরোধী কাজ।

বিপরীতে পীরপন্থীরা বলছেন, "মানুষের মন মারফত, তরিকত ও হাকিকত পর্যায়ে চলে গেলে এসব শরিয়াহর আলোচনা চলে না। চর্মচক্ষু দিয়ে দেখলে হবে না। মানুষ এসব দরগাহতে গিয়ে জিকির করতে করতে ফানাফিল্লাহ পর্যায়ে চলে যায়। তখন কী পরে, কী করে, কী গায় তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। দিদার লাভের জন্য অলি-আউলিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সাথে ধ্যানে ধ্যানে

কানেকশন তৈরি হয়। সেসব বিষয় সাধারণ ধর্মজ্ঞান দিয়ে ও শরীয়ত দিয়ে বোঝা যাবে না। সাধারণ গান করা হারাম বটে। অলিগণ ও তাঁর আশেকগণ যখন গজল, গান ও জিকিরে মগ্ন হয়ে যান, তখন সেখানে যা ঘটে তা সাধারণ গানের আসর দিয়ে তুলনা করা যাবে না। আক্ষরিক কোরআন-হাদিসের বাণী দিয়ে নয়, নবী-রাসুলের ইশক মহব্বতের খেলা বুঝতে হলে কোরআন-হাদিসের গূঢ় অর্থ বুঝতে হবে। নবী-রাসুলদের মাজেজা ও অলি-আউলিয়াদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বুঝতে হবে। এ কোনো সহজ খেলা নয় যে কয়েকলাইন কুরান হাদীস রিডিং পড়েই ফতোয়া দেওয়া যাবে।"

মাজারবিরোধীদের অনেকেই মাজারের ভেতরে নারী-পুরুষের অসামাজিক কার্যকলাপ ও ফকির-মিসকিনদের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সমালোচনা করেন। মাজার ব্যবসা বা দরগাহ জিয়ারতের নামে এসব অন্যায় কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে করেন।

বিপরীতে মাজারপন্থীরা বলেন যে "ওখানে কোনো অসামাজিক কার্যকলাপ হয় না। নারী-পুরুষ সবাই সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে মজতেই সেখানে যায়। দোয়া করতে সেখানে যায়। দুয়েকজন ভুল করলে তার দায় মাজারপন্থী সকলকে দেওয়া যাবে না। এ রকম দু-চারজন ভুল করা লোক সমাজের সব জায়গাতেই আছে, তারা সব না ভেঙে কেবল মাজার ভাঙতে আসবে কেন? ফকির মিসকিনরা এখানে আরাম করতে আসে, খেতে আসে, গোসল করতে আসে। কেউ যদি এখানে এসে শান্তি পায়, সেই শান্তি ভঙ্গ করতে তারা আসবে কেন? প্রত্যেকেরই অধিকার আছে তার নিজের জীবন যাপন করার। ফকির-মিসকিন-প্রতিবন্ধী নানান কিসিমের মানুষ এখানে এসে প্রশান্তি খুঁজে পায়। নবী করিম (সা). তাঁর বিদায় হজের ভাষণে যা যা বলেছেন তা তা মানলেও তারা এসব মাজার ভাঙতে আসত না। তাদের কিছু বলার থাকলে তারা বলুক, আমাদেরকে বোঝাক, আমরাও আমাদের জানা কোরআন-হাদিস ও ইসলামের দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের বোঝাবো। তর্কবিতর্কের মাধ্যমে যা হবার হবে। কিন্তু গায়ে হাত দেওয়া ও ভাঙচুর করা ইসলামের কোন ধারায় পড়ে? মাজার চর্চার কারণে যদি তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে, আমাদের মাজার ভাঙচুর করলে কি আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে না? আমাদের বিশ্বাস ও আকীদা আমাদের কাছে বড়, তাদের বিশ্বাস ও আকিদা তাদের কাছে বড়। তাদের কিছু বলার থাকলে তারা আইনের আশ্রয় নিক। আদালতে মামলা করুক।" আমার নানা একটি কথা বলত– মনে রাখতে হবে,

"নামাজ পড়ি কোমর বাঁকা
রোজা রাখি অঙ্গ শুকা
খাওয়াইলে হাজার ভূখা
এতিম মিসকিন।
মুসলেম হতে বহুদিন"

তথা মুসলিম হওয়া তত সোজা না। কে সঠিক কে বেঠিক, তা নির্ধারণ তত সোজা না।

এসব বিষয়ে মাজারপন্থী ও মাজারবিরোধী অবস্থান বাদ দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে প্রধানত পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে আগত বিভিন্ন ধারার সুফি সাধকদের মাধ্যমেই এই দেশে ইসলাম এসেছে। তাঁদের প্রচারিত মরমিবাদ এই অঞ্চলের মানুষকে নতুন ধর্মে দীক্ষিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণত এ রকম সুফি বা ধর্মীয় প্রচারকদের সমাধিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই মাজার গড়ে উঠেছে। শুধু বাংলাদেশ নয়; দক্ষিণ ও মধ্য এশীয় প্রায় সকল দেশেই ইসলামের এই ধারা স্থান গ্রহণ করেছে। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো, শত-সহস্র বছর ধরে এ দেশে সমন্বিত ধারার যেই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এতে এই ধারার ইসলামের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। ফলে খানকা ও মাজারকেন্দ্রিক ধারা খারিজ করবার অপচেষ্টা সামাজিক বুননকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর সামাজিক স্থিতিশীলতা তো বটেই, রাষ্ট্রীয় সংহতিকেও দুর্বল করে তুলতে পারে। নিঃসন্দেহে মাজার সংস্কৃতি নিয়ে তর্ক রয়েছে; যেইরূপ তর্ক রয়েছে সুন্নি, শিয়াসহ ইসলামের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা নিয়ে। কিন্তু একে অপরকে হামলার মাধ্যমে এই সকল তর্কের নিরসন কস্মিনকালেও সম্ভব নয়; তজ্জন্য বড়জোর নিয়মনীতি মেনে পরস্পরের মধ্যে বিতর্ক হতে পারে। মনে রাখতে হবে, যেই গণতন্ত্রের জন্য সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনে কয়েক শত মানুষ অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে; কয়েক সহস্র মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, সেই গণতন্ত্রেও এক বিশ্বাসের মানুষ– তার ধর্ম বা অন্য যেকোনো বিষয়ে হোক; ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষকে শারীরিক তো বটেই, মানসিকভাবেও আঘাত দিতে পারে না। স্মরণে রাখতে হবে, যেকোনো ধর্মীয় স্থাপনায় হামলা প্রচলিত আইনে গুরুতর অপরাধ। এমনকি অপরের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবু এ রকম অপরাধ দিনের পর দিন একপ্রকার বিনা বাধায় সংঘটিত হচ্ছে।

তদুপরি এই সকল অপকর্ম এমন সময়ে ঘটছে যখন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিশেষত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। "আমরা এ ব্যাপারটি খুব সিরিয়াসলি দেখছি। এই ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে, সে ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকে অবস্থান নিয়েছি। আমরা বারবার বলছি, আমাদের প্রতি ফ্যাসিবাদী শাসকের পক্ষ থেকে যে আচরণ করা হয়েছিল, সেই ধরনের আচরণ যেন কারও প্রতি কোনোভাবেই না হয়, সেটি নিশ্চিত করব। মাজার ভাঙা হোক, মসজিদ ভাঙা হোক, মন্দির ভাঙা হোক; এগুলো গর্হিত কাজ। যেগুলো যেভাবে আছে, সেগুলো সেভাবে থাকা দরকার। আমরা দেশবাসীকে জানাতে চাই, আমাদের কমিউনাল হারমোনি-ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট হওয়ার মতো কোনো ঘটনা যদি ঘটে, আপনারা আমাদের জানালে আমরা মুহূর্তের ভেতরে আইনগত ব্যবস্থা নিবো। "ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে উপাসনালয়ে যারা হামলা চালায়, তারা মানবতার শত্রু, তারা ক্রিমিনাল।"

বিষয়টাকে বোঝার জন্য দুই ঘরনার দুইজনের কাল্পনিক বাহাসটা একটু পড়ি। তাতে করে স্পষ্ট না হলেও আবছা একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

মাজারবিষয়ক কুতর্ক।

: দরগাহে যাওয়া হারাম, তা আপনারা বলেছেন। আমরা তা মনে করি না। আপনারা কীসের ভিত্তিতে বলেন যে দরগাহে যাওয়া হারাম?

: আমরা বলব কেন? কোরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে। কোনো কবরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা বড় শিরক, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং তারা যেন এই সুসংরক্ষিত (পবিত্র) গৃহের তাওয়াফ করে।" (সূরা হাজ্জ: ২৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন: হে আল্লাহ! আমার কবরকে পূজার স্থানে পরিণত কোরো না, যাতে এর ইবাদত করা হয়। আল্লাহ অভিশাপ করেছেন ওই জাতিকে যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে কেন্দ্র করে মসজিদ তৈরি করেছে।" (মুসনাদে আহমাদ) আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে: ইহুদি খ্রিষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লানত। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে

রূপান্তরিত করেছে।" আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল হায়্যায আল আসাদীকে বলেন, "আমি কি তোমাকে এমন আদেশ দিয়ে প্রেরণ করব না, যা দিয়ে নবী (□) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? কোন মূর্তি পেলেই তা ভেঙে চুরমার করে ফেলবে। আর কোনো কবর উঁচু পেলেই তা ভেঙে মাটি বরাবর করে দেবে।" (মুসলিম) সুরা ৭২ এর ২০-২৩ নং আয়াতে বলা আছে। "কেবল আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সাথে আর কাউকে মিলাই না।" সুরা ৭ এর ১২৮ নং আয়াতে বলা আছে, "কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধরো।" কুরানের বহু আয়াত ছাড়াও অনেক হাদিস আছে যেখানে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে আল্লাহপাক ছাড়া আর কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

: আমরা তো আল্লাহর কাছেই চাই। যেহেতু আল্লাহর অলি শুয়ে আছেন। তার মাজারে যাই। তাঁর জীবনী স্মরণ করি। আল্লাহপাক তাঁর যে মুমিন বান্দাকে পছন্দ করেন তার অসিলা করে যেন আমাদেরকে মাফ করেন, সেটা বলি। ক্ষমতা তো সব আল্লাহপাকেরই। নবী রাসুল, গাউস কুতুব, অলি-আউলিয়া কেন পাঠিয়েছেন আল্লাহপাক? আল্লাহপাকের কথা বলার জন্যই। তারাই তো আমাদেরকে হেদায়েতের পথে আনার জন্য কাজ করেছেন। তাদের মাধ্যমেই লক্ষ কোটি মানুষ হেদায়েতের পথে এসেছেন।

: মাজারে ভক্তি করা বা মাজারে মানত, এসব তো হারাম। কোরআন-হাদিসে এসব বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

: মাজার জিয়ারত করা যাবে না, পীরের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, মানত করা যাবে না- এগুলো আপনার ফতোয়া। এগুলো আপনি বিশ্বাস করেন। যে এগুলো বিশ্বাস করে না তার উপর জুলুম করা যাবে না। যে পীর মানে, মানত করে, জিয়ারতে যায়, সেটা তাদের বিশ্বাস। তাদেরকে সেটা করতে দেন। আপনার ভিন্নমত থাকলে তা তাকে বলেন। সুন্দর করে বলেন। আদব লেহাসের সাথে বলেন। আপনার মত আমার মত না-ও হতে পারে।

: মাজারে বসে আপনারা সিজদা দেন, মাজারকে কেবলা করে নামাজ পড়েন, মাজারের পীরের কাছে দোয়া করেন, আশা পূরণের জন্য। এগুলো কি আল্লাহর সাথে শিরক নয়?

: এগুলো মাজারে আসা কিছু সাধারণ মানুষ করে। না বুঝে করে। এগুলো বন্ধ করার জন্য মাজারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাইনবোর্ড টানানো আছে। মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়। এসব লোকের জন্য তো মাজার বাতিল করা যেতে পারে

না। বড়জোর এসব লোককে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

: যদি আপনারা আল্লাহর কাছেই সব চান, তবে মাজারে যান কেন? দরগাহতে কী কাজ? ঘরে বসেই তো আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন। ঘরে বসেই দোয়া করতে পারেন।

: মাজারে বা দরগাহতে যাই প্রয়াত অলি-আউলিয়ার কবর জিয়ারত করতে। জিকির করি। এ জিকির নীরবে বা উচ্চ স্বরে দুভাবে হতে পারে, জিকিরের মাধ্যমে পরম সত্তার সাথে লীন হতে হয়। মাজারের সামনে গিয়ে বসে মন ভরে দোয়া করতে ভালো লাগে। যেকোনো কবরস্থানে গিয়ে জিয়ারত করা গেলে অলি-আউলিয়ার মাজারে গিয়ে জিয়ারত করা যাবে না কেন?

: কেবল তো জিয়ারত করেন না, গানবাজনাও করেন। ইসলামে গান করা হারাম। গান বা বাদ্যযন্ত্র নিষেধ। সেগুলোও আপনারা নিয়মিত করেন।

: মাজার একটা স্মৃতি, সেখানে সবাই আসি। সেখানে গানবাজনা হয়। গান বাজনা করি। গানবাজনা ভালোবাসি। ধর্মীয় সংগীত গাই। আল্লাহর উদ্দেশে প্রেমমূলক যে সংগীত আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তা জাগিয়ে তোলে তাই। গানবাজনা হারাম এটা আপনার বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস না। আপনি আপনার বিশ্বাসে থাকেন, আমরা তো মানা করছি না। আমাদের বিশ্বাসে কেন আপনারা আঘাত হানবেন? আমরা গান গাইতে গাইতে বাজনা বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে পতিত হই। পৃথিবীর নানান দিকে ইসলাম যেভাবে গিয়েছে সেখানে এসব কালচারাল দিকসহই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

: কিন্তু কোরআন হাদিসে তো সুস্পষ্টভাবে গানবাজনা নিষেধ করা হয়েছে। "তোর আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস পদস্খলিত কর।"-সূরা ইসরা : ৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে সকল বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তাই ইবলিসের আওয়াজ। বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. বলেন, ইবলিসের আওয়াজ বলতে এখানে গান ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যেসব বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তার মধ্যে গানবাদ্যই সেরা। এ জন্যই একে ইবলিসের আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।-ইগাছাতুল লাহফান ১/১৯৯. "তোমরা গায়িকা (দাসি) ক্রয়-বিক্রয় কোরো না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিয়ো না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রেখো, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম।"-জামে তিরমিযী হাদিস : ১২৮২; ইবনে মাজাহ হাদিস : ২১৬৮

: ইসলামে গান নিষিদ্ধের যেসব হাদিস পাওয়া যায় তা সবই বনু উমাইয়া আমলে তৈরি। আপনি কোরআনে গানের বিরুদ্ধে কোনো আয়াত দেখাতে পারবেন না। তৎকালীন গীতিকার, গায়ক, কবিরা তাদের গানে গানে উমাইয়াদের সমালোচনা করত। তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ধর্মের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে? গোয়েবলসরা ওই যুগেও ছিল। এসব হাদিস খলিফাদের সপক্ষে প্রচারিত হয়। ক্রমে ক্রমে সেগুলো টেক্সটে স্থান পায়। গান গাওয়া যাবে না-টাইপের আপনার কোরআনিক ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে। আমাদের ব্যাখ্যা আমাদের কাছে। আপনাদের ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, বলেন। আমরা শুনি। দেখেন আমরা কনভিন্সড হই কি না।

: কোরআনের বাণী নিজের মতো অনুবাদ করলেই হবে না। তা বোঝার মতো প্রজ্ঞাও লাগবে। যেকোনো বাণীর শানে নুযুল ও ব্যাখ্যা বুঝতে হবে। আল্লাহ কেবল কোরআনই দেয়নি। আল্লাহ আপনাকে বুদ্ধিও দিয়েছে। আপনাকে বিচার, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান দিয়েছে। ইসলাম মানবতার কথা বলেছে, সাম্যের কথা বলেছে, ইসলাম ন্যায়বিচারের কথা বলেছে। সব ভুলে গিয়ে কেবল আক্ষরিক অনুবাদ নিয়ে পড়ে থাকলে হবে?

: আপনাদের কারণে, আপনাদের মাজার পূজার কারণে, আপনাদের বিদাতের কারণে ইসলামের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট হচ্ছে। অন্য ধর্মের মানুষ আমাদের দিকে আঙুল তুলে হাস্যরস করছে। আমরা আমাদের ইমানি দায়িত্ব মনে করি এসব মাজার ব্যবসা বন্ধ করা। তাই আমরা সকল মাজার গুঁড়িয়ে দেব।

: সৌদি সালাফিরা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি সরাতে পেরেছে? তেল বিক্রি বন্ধ করতে পেরেছে? তারা কি ইজরাইলের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে? তারা মাজার ভাঙ্গায় এত সমর্থন করে কেন? মাজার নরম জায়গা বলে? মাজারে যারা থাকে তারা মারমুখী না বলে? পারলে ইসরাইল বা এ রকম ক্ষমতাধরের বিরুদ্ধে গিয়ে জিহাদ করেন। সালাফিদের কথামতো নেচে বাংলার মাজারে উগ্রতা দেখাবেন না।

: নবী-রাসুলের নির্দেশনা অনুসারে আমরা ইসলামের সঠিক পথ মানুষের মধ্যে প্রচার করি। আমাদের সামর্থ্য অনুসারে যেখানে সম্ভব তা বাস্তবায়ন করি। এটা তো আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

: মানুষকে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গরু-ছাগলকে দেওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের বিচার-বিবেচনা যুক্তি, তর্ক, চিন্তা করার ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহপাক মানুষকে এ গুণ দিয়েছেন। তাই মানুষ যা গ্রহণ করবে তা যুক্তি তর্ক দিয়ে গ্রহণ করবে, যে বর্জন করবে তা যুক্তি দিয়ে বর্জন করবে। সুতরাং

আপনারাও প্রচার করেন। কিন্তু জোরজবরদস্তি করার দরকার নেই। আমরাও প্রচার করি। ভক্তি, সুন্দর কথা ও তাজিমের সাথে প্রচার করি। আপনারাও করেন।

: সত্যি করে বলেন তো, আপনারা কি মাজারে কেবল জিয়ারত করতে যান, নাকি রং তামাশা করতে যান। বেশির ভাগ মাজারে গেলে তো নানান রকম তামাশা দেখা যায়। গাঁজার গন্ধে চারপাশ ধূমায়িত, নারী-পুরুষ নাচানাচি ম্যাসাকার অবস্থা। এখানে ইসলাম কোথায়?

:চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বেশির ভাগ মাজারে কোনো রকম গান বাজনা লাফালাফি কিছু নেই। কিন্তু শহরের বাইরে যে সকল মাজার আছে সেখান অনেক রকম শিরক বেদাত মাদকের ঘটনা ঘটে। সেখানে মানুষের ঢলাঢলি নাচানাচি ফালাফালি সব চলে। বাস্তবতা হলো অনেক গরিব মানুষ এখানে এসে আনন্দ পায়। এমনকি অন্য ধর্মের লোকজনও আসে। নানান মানত করে, দান করে। গরীব ফকির-মিসকিন সবে মিলে ধর্মীয় গানে গানে মেতে ওঠে। এসবকে অনেকে 'গরিবের আনন্দ' বলে মনে করে। গরিব মানুষের জন্য ওটাই একটা বিনোদন, তাই ওখানে সবাই লাফালাফি ফালাফালি করে। আসলে সবাই আধ্যাত্মিক শান্তি ও মুক্তি চায়। একেকজন একেকভাবে পায়। তারা হয়তো মাজারে গিয়ে লাফালাফি করে এসবে লিপ্ত হয়ে মানসিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রত্যাশা করে। গাইতে গাইতে, জিকির করতে করতে নিজেকে হারায়ে। এটা হচ্ছে একধরনের আধ্যাত্মিক মানসিক অবস্থা যা তার অন্তর দৃষ্টি লাভে সাহায্য করে। সুফিদের কাছ থেকেই ভক্তরা এসব শেখে, রপ্ত করে।

: স্বীকার করার জন্য ধন্যবাদ। পাগলরা ঢুকে পাগলামি করে। একজন ধার্মিক মুসলমান, ইসলাম সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান না রাখলেও কোন কাজটি ইসলামে শোভা পায় তা অন্তত বুঝতে পারে। আমাদের উপমহাদেশে অসংখ্য-অগনিত মাজার রয়েছে। আর এই মাজার বলতে আমি বোঝাচ্ছি কবরের মাজার। কেননা মাজার অর্থ হচ্ছে বাগান। তো, কবরে গিয়ে নাচানাচি করা একধরনের পাগলামি, যারা এটা করে তারা আসলেই পাগল। এসব পাগলামি একটু পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে আপনার চোখে একটি বিষয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই পাগলগুলো কিছুটা ভণ্ড-সাধু প্রকৃতির। অর্থাৎ ঘরবাড়ি, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম স্ত্রী-সন্তান সব ছেড়ে দিয়ে তারা সেখানেই অবস্থান করছে, এবং সাধুগিরির নামে সব অসাধু কাজ (মদ্যপান, গাজা, ইয়াবা

ইত্যাদি সেবন) করছে। সমাজের সরলমনা মানুষগুলোর আবেগ-অনুভূতি আর অন্ধ বিশ্বাসকে পুঁজি করে হাতিয়ে নেয়া হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। তা দিয়েই তারা নিজেদের মাঝে বণ্টন করে এই অসাধু কাজগুলো বা তাদের নোংরা চাহিদাগুলো সম্পূর্ণ করছে।

: যারা পাগলামি করে বা বাড়াবাড়ি করে তাদের কথা আলাদা। এ জন্য মাজার বা অলি-আউলিয়াকে দায়ী করা যায় না। আচ্ছা বলুন তো, কোনো ব্যক্তি যদি মূর্তিপূজা করে, তাহলে এর জন্য কি ইসলাম বা মুসলমানদের দোষ দেয়া যাবে? যাবে না। কারণ, তারা তো এটা স্বীকৃতি তো দূরের কথা; বরং ঘৃণা করে। একইভাবে যারা মাজারে বৈধতার নামে অবৈধ নাচানাচি নামক পাগলামি করে যাচ্ছে, তাদের দায়ভার ইসলাম কিংবা মুসলমানদের উপর বর্তাবে কেন? মাজার বা আউলিয়ার উপর চাপনো কেন? ইসলাম তো এটার স্বীকৃতি দেয়ই না বরং নিষেধ করে। তাই না? এই সহজ সমীকরণগুলো আমাদের সমাজের যেকোনো সচেতন ধার্মিক মানুষই বোঝে! কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জানে এবং বোঝে যে ইসলামে এর কোনো স্থান নেই। তবু তারা ইসলামকে সমালোচিত করার জন্য বিষয়টিকে না জানার ভান করে অপপ্রচার চালায়!

: কবরে সিজদা করা হারাম। (বুখারী: ১৩৩০); কবরকে মসজিদ বানানো হারাম। (আবু দাউদ ৩২২৭, নাসায়ী ২০৪৭) কবরের উপর বসা ও সালাত আদায় নিষিদ্ধ। (মুসলিম ২১৪০, নাসায়ী ২০৪৪), কবরের মধ্যে ওরস-মেলা এবং কবরকে উৎসবের স্থান বানানো হারাম। (আবু দাউদ: ২০৪২), রাসুল (সা.)বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্'সা ও মসজিদে নবি ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। এ রকম আরও অনেক হাদিস আছে।

: আমরা তো এগুলো করি না। আমরা কেবল মাজার জিয়ারত করি। আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করি, সকলের নাজাতের জন্য। দোয়া করি আশা পূরণের জন্য। এর বাইরে যারা এসব করে তারা আসলে নিয়ম ভাঙার দলে। এর দায় মাজার বা মাজার কমিটিকে দেওয়া যাবে না।

: এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে মাজারের ফান্ড কালেকশনের কোনো যথাযথ হিসাব রাখা হয় না। খরচের কোনো নিয়মনীতি নেই। বছর শেষে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা অডিট করা হয় না। মাজারের খাদেম বা কমিটি তহবিল তছরূপ বা অনিয়ম করে। সমাজ ও রাজনীতির নেতাদের সাথে হাত মিলিয়ে

সব সাবাড় করে। সাথে কিছু হুজুরও রাখে। মিলেমিশে চুরি। কোনো আওয়াজ নেই। তা-ছাড়া মাদক কারবারি ও চোরাকারবারিদের সাথেও নাকি মাজারের লোকদের সংশ্লেষ থাকে।

: মানুষের দানকে যথাযথ কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। সমাজ ও দেশের সব জায়গায় যেহেতু চোর আছে, যেহেতু দেশের সকল মসজিদ কমিটি খাঁটি মুসল্লি না, সেহেতু মাজারের খাদেম ও কমিটির লোকে সবাই ফেরেশতা এমন দাবি আমরা করতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমাদের শোধরাবার ও সচেতন হওয়ার সুযোগ আছে। আর আপনারাও দেশ, সমাজ সব ঠিক করে তারপর মাজার ঠিক করতে আসেন। পুরো সমাজে চোর বিরাজমান হবে মাজার-দরগাহতেও তা-ই হবে। মাজারে যেহেতু সকল ঘরানার লোক আসে, সেহেতু মাদকাসক্ত ও চোরকারবারিদেরও কানেকশন থাকতে পারে। কার মনে কী আছে কে জানে। মাজার কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। হাতে ফোড়া হলে আমরা ফোঁড়াই কাটি, হাত কেটে ফেলি না।

: যত কথাই বলেন, কোনো লাভ নেই। আমরা কোরআন-হাদিসে অক্ষরে অক্ষরে মানি। এর বিরোধী যেকোনো কার্যক্রম আমরা রুখে দিবো। যারা এসব করবে তাদেরকে দেখে নেওয়া আমাদের ইমানি দায়িত্ব। প্রয়োজনে জোর করে ব্যবস্থা নেব। আমাদের গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো কাজ হতে দেব না।

: আপনারা বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা বা আলিয়া মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ছাত্রদের নিয়ে মব তৈরি করেন। তাদের নিয়ে হামলা করেন। শক্তি আছে করবেন। তবে মনে রাখবেন যদি একটি মাজার ভাঙেন বা ধ্বংস করেন, তবে আরও শত মাজার তৈরি হবে। যদি একজন মাজার জিয়ারতকারীকে আক্রমণ করেন তবে লক্ষ মাজারপন্থী তৈরি হবে, যদি মাজারে থাকা যেকোনো শান্তিপ্রিয় বাউল পাগলদের গায়ে হাত তোলেন, তবে হাজারও বাউল তৈরি হবে। তথা মাজারপন্থী তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আপনি কয়জনকে আটকাবেন, কয়টি মাজার ভাঙবেন? কয় দিন আক্রমণ করবেন? যারা নিপীড়িত ও অসহায় তাদের উপর আক্রমণ হলে তারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ে, দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে কোটি মানুষের রূপান্তর হয়।

: আপনি কি হুমকি দিচ্ছেন? হুমকি দিয়ে লাখ লাখ মুসলমান জনতাকে ধাবিয়ে রাখা যাবে না। ইসলামের সুরক্ষার জন্য কোরআন-হাদিসের সুরক্ষার

জন্য তারা প্রয়োজনে জীবন দেবে।

: আমরা হুমকি দিলাম কোথায়? আমরা যেমন শান্তিপ্রিয় আছি, তেমনি থাকব। আপনারা আক্রমণ করলে যে মানুসের মনের ভিতরে মাজার প্রীতি তৈরি হবে, সেটা মনে করিয়ে দিলাম। আমরা কখনো কারও কাছে জোর করে ধর্ম প্রচার করি না। অহিংসা ও প্রশান্তির পথই আমাদের পথ। বরং আমরা ধৈর্য ধারণ বা আত্মসংযম করি। আত্মসংযমী হই। সকল বিপদে ধৈর্য ধারণ করি এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিই। পবিত্র ভাবনা করি। দেহ এবং মন পবিত্র রাখি; কারণ, অন্তরের পবিত্রতার উপর আল্লাহর জ্যোতি প্রতিবিম্ব হয়। মানুষের প্রতি ভক্তি বা প্রেম রাখো। ভয়ে নয় প্রেমে আল্লাহর দিদার লাভ করতে চেষ্টা করি। আল্লাহর প্রেমে জাগতিক সবকিছু ত্যাগ করি। ভয়ে নয় প্রেমের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দিদার লাভই আমাদের লক্ষ্য। ধ্যান করতে করতে ফানাফিল্লাহ পর্যায়ে যাই। যেখানে আলাহর সংগে সম্মিলনের মুহূর্তে যাই। তখন জাগতিক বিষয়ের সকল চাওয়া-*পাওয়ার অবসান হয়। এই স্তরে আমাদের নিজের কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকে না। যেটাকে বলে মরার আগে মরা। আল্লাহর প্রেমের মরা। এর পরে আমরা আল্লাহর চেতনার সাথে অন্তর্লীন হয়ে যাই। তখন আমার বা আমিত্ব বলে কিছু থাকে না।

: এসব আলাপ হচ্ছে ভণ্ডমি। মাজারে বসেই আল্লাহর কাছে চলে যাওয়া। যত্তসব। এসব মাজারে ঘুরাঘুরি, নারী-পুরুষ দিনরাত থাকা, ইবাদতের নামে নানান কাজকর্ম–এগুলো বিদাত। যা আগে কখনো ছিল না, যা কুরআন-হাদিসে বলা নেই, তা পালন করাই বিদাত। আপনারা বিদাতে লিপ্ত।

: কোরআন-হাদিসে নেই এমন অনেক বিষয় ইজমা কিয়াস দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। যা এখনো মানুষ পালন করছে। আর বিভিন্ন কবর জিয়ারত এগুলো নবী করিম (সা.)-এর জীবদ্দশায় যেমন ছিল। তাঁর ওফাতের পরেও ছিল। খেলাফত আমলেও ছিল। এসব বন্ধ হয়েছে কেবল ২০০ বছর আগের কথা। ১৮ শতকের শুরুর দিকে আব্দুল্লাহ বিন সৌদের সময় থেকে এ সমস্যা তৈরি হয়। সৌদ ও ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী ইমাম ওহাবের সমন্বয়ে সৌদি শাসনব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয় তার মাধ্যমেই সকল কবর জিয়ারত বন্ধ হয়। এমনকি নবীজির রওজাও ভাঙচুর করতে চেষ্টা হয়েছিল। যা ওসমানীয় খেলাফতের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছে। সৌদ, ফয়সাল, খালিদ, ফাহাদ, আব্দুল্লাহ ক্রমানুসারে সৌদি এলাকা শাসন করে যায়। যে কারণে সাহাবাদের কবর, হজরত আলী কিংবা ফাতেমা (রা.), হাসান হোসাইনের কবরও রক্ষা করা সম্ভব

হয়নি। সৌদ-ওহাবির হাত ধরেই বিদাতের ফতোয়া ছড়িয়ে পড়ে।

: এসব সৌদ-ওহাবের আলোচনা দিয়ে কোরআনকে বাদ দেওয়া যাবে না। সৌদ-ওহাব যা-ই বলুক না কেন, আমরা কেবল কোরআন-হাদিসে যা লেখা আছে– তা-ই মানি। এসব ইতিহাসের প্যানপ্যানানি দিয়ে আমাদেরকে দমানো যাবে না।

: কোরআন-হাদিসে যা আছে আমরাও তা-ই মানি। কোরআন-হাদিসে আল্লাহপাকের সাথে কাউকে শিরক করতে না করেছে, আমরা তা করি না। অলি-আউলিয়ার কাছে কিছু চাইতে না করেছে, আমরা চাই না। কিন্তু কবর জিয়ারত বা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে তো নিষেধ করা হয়নি। আমরা অলি-আউলিয়ারা যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেসব পথেই চলি। আমরা যেসব সুফিকে মানি সেসব সুফিদের রয়েছে বিভিন্ন তরিকা। স্থান ও কাল অনুযায়ী অসংখ্য সুফি তরিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি তরিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–১. গাউছুল আজম বড় পীর হজরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া তরিকা, ২. সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত চিশতিয়া তরিকা, ৩. গাউছুল আজম হজরত আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী প্রতিষ্ঠিত কাদেরিয়া মাইজভান্ডারিয়া তরিকা, ৪. হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া তরিকা এবং ৫. হজরত শেখ আহমদ মুজাদ্দিদ-ই-আলফে ছানী সারহিন্দী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত মুজাদ্দেদিয়া তরিকা।

: মাজারে এ রকম হয় না। মাজারে বড় বড় আউলিয়ার নাম বিক্রি হয়। মূলত অনেকেই যায় মাজারের কাছে দাবি করতে। অনেকেই সরাসরি মাজারের কাছে বা শায়িত অলির কাছে বিভিন্ন আশা পূরণের আরজি করে।

: হাজার হাজার মানুষ আসে। এর মাঝে কেউ যদি এসে ভুল করে, তাকে ভুল পথ থেকে শোধরানোর দায়িত্ব আমাদের আপনাদের সবার। তাই বলে মাজারে যাওয়া যাবে না, মাজার ভাঙতে হবে, মাজারকে পাকা করা যাবে না, মাজার সুরক্ষা করা যাবে না–এগুলো বাড়াবাড়ি রকমের ফতোয়া।

: বুঝছি, সারা রাত বোঝালেও আপনারে সঠিক পথে আসবেন না। বিদাত ও পাগলামি করেই যাবেন। ধর্মগ্রন্থ বোঝার মনন আপনাদের হবে না।

: আমরাও বুঝছি, হাজার বোঝালেও আপনারা তালগাছ আমার–এ প্রবাদের মতো অবস্থায় থাকবেন। ধর্মগ্রন্থ বোঝেন, কিন্তু ধর্ম বোঝেন না।

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে প্রগতিশীলতা ও উদারতা কই?

১.

কেস-এক: রাঙামাটি, বান্দরবান কিংবা মৌলভীবাজারে কাজ করার সময় কোনো কোনো গবেষক, অফিসার, এনজিও মালিক বা ক্ষমতাধরদের সাথে কথা হতো। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি যে "চাকমা, মারমা, মণিপুরি তথা উপজাতিদের আলাদা স্কুল না রেখে সবখানে বাংলা মিডিয়ামে পড়ানোর ব্যবস্থা করা, তথা মেইনস্ট্রিমে নিয়ে আসা দরকার। ওরা নিজেদের ভাষা শিখে পরে আবার বাংলায় ভালো করতে পারে না। সবাইকে একমুখী শিক্ষায় নিয়ে আসা দরকার।" আসলেই কি তাই হওয়া উচিত?

কেইস-দুই: বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের আশ্রমে, প্যাগোডায় বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কতিপয় ভিক্ষু থাকেন। ওনারা সেখানে ধর্মীয় দীক্ষা লাভ করেন এবং নির্দিষ্ট জীবনাচরণ অনুসরণ করেন। অনেকে সমালোচনা করেন যে, সেখানে ওসব না করে মেইনস্ট্রিমে থাকা উচিত। জগৎ সংসার, বিজ্ঞান, সমাজ, গণিতে শিক্ষা দরকার। অর্থনীতিতে ভূমিকা দরকার। আসলেই কি তাই হওয়া উচিত?

কেস-তিন: মন্দিরভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা ভারত-বাংলাদেশে ও চার্চভিত্তিক শিক্ষা ইউরোপের অনেক দেশে ছিল ও আছে। কেউ কেউ এসব ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পুরো জীবন পার করে দেন। অনেকে দাবি করেন এসব বন্ধ করে দেওয়া উচিত, এগুলো সেকেলে। আসলেই কি তাই হওয়া উচিত?

কেইস-চার: ব্রিটিশরা আড়াই শ বছর আগে ভারতবর্ষে এসে বলল সবাইকে ইংরেজি বলতে হবে, শিখতে হবে, স্প্যানিশরা দক্ষিণ আমেরিকায়, ফরাসিরা আফ্রিকায় গিয়ে তাদের ভাষা চাপিয়ে দিয়ে এসছে। ওসব ভাষা না হলে নাকি সভ্য, উন্নত আর আধুনিক হবে না। আসলেই কি তাই হওয়া উচিত ছিল?

কেস-পাঁচ: মাদ্রাসা শিক্ষা মানেই হলো ধর্মশিক্ষা। ওখানে আধুনিক সমাজ, বিজ্ঞান বা গণিতের মারপ্যাঁচ শেখানো হয় না বা কম শেখানো হয়। তাই

মাদ্রাসা বন্ধ করার জন্য অনেকে সুপারিশ করেন। আসলেই কি তাই হওয়া উচিত?

উপরের পাঁচটি বিষয়সহ এ রকম আরও হাজার উদাহরণ দেওয়া যাবে যেখানে আমাদের অনেকেই বলব, হ্যাঁ ওসব ব্যাকডেটেড ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, কৃষিভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হবে। এবং আমাদের এই বলা অনেক প্রমাণ দিয়ে যৌক্তিকতাসহ বলতে পারব যে এটা-ওটা ভালো না, আধুনিক শিক্ষা ভালো।

প্রশ্ন হচ্ছে, আধুনিক শিক্ষা বা হালনাগাদ শিক্ষা কোনটা? আমি যেটা বাংলা মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম আর অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপে বসে শিখছি, সেটা আধুনিক শিক্ষা? সেটা কি হালনাগাদ শিক্ষা? আমরা কি সুনিশ্চিত? যেটাকে আধুনিক শিক্ষা বলছি সেটা কি চাপিয়ে দেওয়া নয়? বানিয়ে বানিয়ে খাইয়ে দেওয়া নয়? গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ আর ভোগবাদের মতো পরিকল্পিত ফর্মুলা নয়?

আমি যেটাকে ভালো ভাবছি সেটা গ্রহণ করছি। যেমন বাংলা মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম, অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা। আরেকজন যেটাকে ভালো মনে করবে সেটাকে সে গ্রহণ করবে। প্রত্যেকের ইচ্ছানুসারে গ্রহণের সুযোগ রাখাটাই গণতন্ত্র বা প্রগতিশীলতা। একজন ব্যক্তি বা একটি সমাজ, একটি কমিউনিটি যদি মনে করে যে তাদের নিজস্ব ভাষা বা সংস্কৃতিভিত্তিক শিক্ষা রাখা দরকার, যদি মনে করে যে ধর্মীয় শিক্ষা রাখা দরকার, যদি মনে করে যে বাংলা মিডিয়াম রাখা দরকার, তবে তাদেরকে সে সুযোগ দেওয়াটাই আধুনিকতা, সেটাই প্রগতিশীলতা। সেটা করতে না দেওয়াটাই হবে সাম্প্রদায়িকতা বা কট্টরপন্থী আচরণ।

আমি নিজে না চাইতে পারি মসজিদ/মন্দির/প্যাগোডা/গীর্জাভিত্তিক শিক্ষা। কিন্তু যারা চায় তাদের চাওয়ার অধিকারের পক্ষে কথা বলাটাই হবে প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত প্রগতিশীলতা। আমি হয়তো অনেক বড় হব, বড় বিজ্ঞানী হব, বড় নেতা হব, বড় ব্যবসায়ী হব, বড় অফিসার হব, বড় গবেষক হব, বড় সমাজবিজ্ঞানী হব, এটা আমার অ্যাম্বিশন। কিন্তু পৃথিবীতে অনেকের জীবনের অ্যাম্বিশনই হলো নিজ ভাষা রক্ষা প্রচেষ্টায় জীবন পার করে দেওয়া, যাদের জীবনের লক্ষই হলো ইসলাম/হিন্দু/বৌদ্ধ/খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষায় জীবন পার করে দেওয়া, যাদের লক্ষ্যই হলো পীর সাহেব বা ভান্তের বা ঠাকুরের সেবায় জীবন কাটিয়ে দেওয়া, তাঁদেরকে বাধা দেওয়া বা নাকচ করে দেওয়া কখনোই গণতান্ত্রিক আচরণ নয়, আধুনিক আচরণ নয়, প্রগতিশীল আচরণ নয়।

গতকালের আধুনিকতা আজকের সেকেলে, আজকের আধুনিকতাই কালকের পুরাতন। সবই আপেক্ষিক। কোথায় বসে কেন কীভাবে ভাবছি। নলেজের কোন প্রেক্ষাপটে কোন নলেজকে কোন নলেজের সাথে রিলেট করছি, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

হ্যাঁ এসব ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক বা সংস্কৃতিভিত্তিক বা অন্য কিছু ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলো কীভাবে দূর করা যায়, কমপ্রিহেনসিভ করা যায়, সে নিয়ে কথা হতে পারে। একেবারে বাদ দিয়ে দেব বলা মানে হলো মেজর কয়েকটি ধর্মসহ সকল ধর্মের ও সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক জগতে আঘাত হানা।

অনেকেই বলেন অমুক ধর্ম তমুক ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসই জগতের সকল অপকর্মের কারণ। তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই, এখন যেসব ধর্মের আধিপত্য সেসব ধর্ম যখন ছিল না তখনো মানুষে মানুষে অপকর্ম বা হত্যাকাণ্ড চলমান ছিল। গুটিকয় লোকের দোষে গোটা সমাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করা অবান্তর। প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি সমাজের, প্রতিটি চিন্তার, প্রতিটি তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা জরুরি।

কুয়োয় বাস করার অভিজ্ঞতা দিয়ে সমুদ্র নিয়ে মন্তব্য করা যেমন অসমীচীন, তেমনি সমুদ্রে বাস করার অভিজ্ঞতা দিয়ে কুয়ো নিয়ে মন্তব্য করাও অসমীচীন।

জগতের প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, শ্রেণি, পেশা, রং, গোত্র, দেশ বা কাল যা-ই হোক না কেন প্রতিটি রীতি, আচার বা প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদা দিতে হবে, টেকসই হতে দিতে হবে, সংস্কার বা প্রস্ফুটনের সুযোগ দিতে হবে, সংরক্ষণ করতে হবে। মৌল না হারিয়ে যতটা উন্নত করা যায় কমপ্রিহেনসিভ করা যায় তা করতে হবে। তা-ও সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিকে আহত না করে। সময়ের বিবর্তনে যা কিছু ভালো, যা কিছু সেরা, যা কিছু উত্তম তা টিকে যাবে। যোগ্যরাই টিকে থাকে। সময় সব ঠিক করে নেবে।

২.

হাল জমানায় মানুষ নানান ইস্যুতে দুই ভাগ হয়ে একে অপরের বিশ্বাস, আচার, ধারণাকে এমন নগ্নভাবে আক্রমণ করছে আর ভাইরাল করছে, তাতে সমস্যা বাড়ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কেবল ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। ঘৃণার চাষাবাদ বা ট্রল হচ্ছে।

একদল বলে পয়লা বৈশাখ পালন করা যাবে না, পান্তাভাত বাদ দিতে হবে,

লাল-সাদা শাড়ি পরা যাবে না, কপালে টিপ দেওয়া যাবে না। এগুলো আমাদের সংস্কৃতি না। আরেক দল বলে গির্জা-মন্দির-মসজিদ-মাদ্রাসাভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা রাখা যাবে না, ধর্ম প্রচার ও প্রসারের সব আয়োজন বন্ধ রাখতে হবে, ধর্মীয় লেবাসের পোশাক পরা যাবে না। এগুলো আমাদের সংস্কৃতি না। এক ধার্মিক আরেক ধার্মিকের আচারকে বাতিল করে দেয়। মাজারে যাওয়া যাবে না, মানত করা যাবে না, ঈদে মিলাদুন্নবী করা যাবে না, শবে বরাত করা যাবে না ইত্যাদি রায় ঘোষণা করে জোর করে বাস্তবায়ন করতে চায়।

কালচার বা সংস্কৃতি কী? কিংবা আমাদের সংস্কৃতি কী? সহজ করে বললে মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, রুচি, মূল্যাবোধ, কিংবা খাওয়ার বা ব্যবহার্য উপাদানসমূহ যা প্রজন্মের পরে প্রজন্ম টিকে থাকে, তা-ই তাদের কালচার বা সংস্কৃতি। এখন আমাদের কোন কোন অনুষঙ্গ প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে আছে?

পান্তাভাত দাদার দাদারা খেত, আমরাও এখন খাই। তাই এটা আমাদের কালচার। হয়তো ভবিষ্যতে কেউ খাবে না, তখন আর কালচার থাকবে না। যত দিন পান্তা খাওয়া চলবে, তত দিন এটি আমাদের কালচারের অংশই থাকবে। যখন বন্ধ হবে তখন এটা হবে অতীত ঐতিহ্য।

আচ্ছা, আমাদের দাদার দাদাদের আমলে সবাই খোলা জায়গায় পায়খানা করত। ওটা কি আমাদের কালচার ছিল? এখন সবার ঘরে ইংলিশ কমোড। এটা আমাদের কালচার হয়ে গেছে?

বৌদ্ধধর্মের হাজার বছর, হিন্দুধর্মের হাজার বছর আর ইসলাম ধর্মের দেড় হাজার বছরে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নানান অভ্যাস বা রুচি বা বিভিন্ন অনুষঙ্গ ছিল বা এখনো আছে। নানান বিবর্তন বা পরিবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে। প্রজন্মের পরে প্রজন্ম যা টিকে থাকে তা-ই যদি সংস্কৃতি হয়, তবে আমাদের সংস্কৃতিতে যা যা ছিল তা তা আমাদেরই। যা যা এখন নেই তা তা আমাদের অতীত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। যেগুলো এখনো আছে সেগুলোও আমাদের সংস্কৃতি। ব্রিটিশরা দুই শ বছর শাসন করে যেসব রেওয়াজ, আচার ও রীতি আমাদের দিয়ে গেছে এগুলোর যেসব আমরা পুরোপুরি শত বছর ধরে পালন করছি, সেগুলো কি এখনো বিদেশি সংস্কৃতিই থাকবে? সেগুলো কি এখন আমাদের সংস্কৃতি হবে না? ইসলাম বা খ্রিষ্টধর্মের যেসব ধর্মীয় রীতি এ অঞ্চলের মুসলমান বা খ্রিষ্টানদের মধ্যে হাজার বছর ধরে পালিত হচ্ছে, সেগুলো কি

তাদের সংস্কৃতি হবে না?

সুতরাং কোনটা আমাদের সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি না, তা চট করে বলা যায় না। প্রতিটি মানুষ তার পূর্বপুরুষ ও এ অঞ্চলের হাজার বছরের নানান অনুষঙ্গের নির্যাস মনে-মগজে বয়ে বেড়ায়। এ কারণেই বৈচিত্র্য দেখা যায়। যে যার মতো মানুষ পালন করুক। বিশ্বাস করুক। যে যা পালন করে বুঝতে হবে সে সেই সব অনুষঙ্গ দীর্ঘ চর্চা বা বিবর্তনের মাধ্যমে তার কাছে আসা সংস্কৃতিই সে পালন করছে।

উত্তম পন্থা হচ্ছে কাউকে আক্রমণ না করা, হেয় না করা, অপমান না করা। যার যেটা ভালো লাগে করবে। আমাদের যদি কারও কাছে মনে হয় আমাদেরটা উত্তম সেটা আমরা বলব সহনীয় উপায়ে নন্দিত ভাষায়। আক্রমণ করে নয়, ঘৃণা ছড়িয়ে নয়।

কুকথা, কুতর্ক, অজ্ঞতা, অবজ্ঞা, নগ্নতা ওই পেট থেকে বেরিয়ে আসা বমির মতো। যে কথা বা কাজ মানুষ, সমাজ, দেশ ও সৃষ্টিতে ঘৃণা ছড়ায়, অশান্তি বাড়ায়, তা না বলাই ভালো। যার প্রকাশ যত আক্রমণাত্মক ও ঘৃণা ছড়ানোর মতো, তার জানা ও বোঝা তত কম ও স্থূল। আকথা, কুকথা, হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ছড়ানো সব পেটের ভেতরে রাখা ভালো। বের হলে বমির মতোই দুর্গন্ধ ছড়ায়।

যদি কেউ উত্তম হন, কারও মত যদি অন্যতম উৎকৃষ্ট হয়, আর কারও যদি উৎকর্ষ সাধন করার জন্য কিছু বলার থাকে, তবে এমনভাবে বলা উচিত যেন মিষ্ট শোনায়, পৃথিবী আলোকিত হয়, বিশ্ব শান্তিময় হয়।

যার যার সংস্কৃতি তাকে পালন করতে দেওয়া উচিত। যারটা টেকার টিকে যাবে। অতীতকালের অনেক সংস্কৃতি আমরা এখন পালন করি না। আমাদের অনেক সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পালন করবে না। যদি করে ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহমান থাকে, তবে সেটাই তাদের সংস্কৃতি!

এভাবেই শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা প্রগতিশীলতা ও উদারতায় টেকসই হবে। মানকল্যাণ হবে আর পৃথিবী আলোকিত হবে।

পরিচ্ছন্ন নগরী তৈরি কার দায়?
সরকার না নাগরিক

নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখা সরকারের দায়িত্ব। হোক তা কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় সরকার। নগরীর সকল উন্নয়ন করা এবং সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখা সরকারের দায়িত্ব, এটা প্রায় সব নাগরিক মনে করে। তা করুক। সরকারই করবে। কিন্তু কেবল কি সরকারেরই দায়? নাগরিকদের দায় নেই? বিশেষ করে যেসব দেশের নাগরিকেরা সুশিক্ষিত ও সচেতন কম, সেসব দেশে নাগরিকদের মধ্যে এ ধারণাটা বদ্ধমূল যে "কেবল সরকার কাজ করবে"। তাই নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নাগরিকেরা কোনো ভূমিকা রাখতে অনীহা প্রকাশ করে। আমরা যখন বলি সিটি, তখন 'সিটিজেন' শব্দটিও মাথায় রাখতে হবে। আমরা যখন বলি নগর, তখন 'নাগরিক' শব্দটিও মনে রাখতে হবে। তথা যে মানের সিটিজেন বা নাগরিক একটি নগরীতে বাস করে, সে মানের পরিচ্ছন্নতা আমরা দেখতে পাব একটি নগরীতে। এ সেক্টরের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করা জরুরি।

বিশ্বের সবচাইতে দূষিত বা অপরিচ্ছন্ন নগরীর তালিকার দিকে তাকালে আমরা দেখব যে বাংলাদেশের কয়েকটি নগরী তাতে অনায়াসে জায়গা নিয়েছে। এখন এ জন্য দায়ী করব কাকে? নিশ্চয়ই সরকারকে। এখন কে এই সরকার? কারা এই সরকার বানায়? বিশেষ করে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণ তো এ নগরী থেকেই আসে। সরকারকে যদি সব দায় দিইও, সরকার যদি সব কাজ করেও তবু কি পরিচ্ছন্ন নগরী হবে? আমার মনে হয় হবে না। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একটি নগরীতে যদি ১০ লক্ষ লোক বাস করে এবং সবাই যদি যত্র-তত্র ময়লা ফেলে, নগরীর কোনো নিয়ম না মানে, তবে নগরীর হাজারখানেক কর্মচারীর পক্ষে নগরী পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। এমন অনেক

উদাহরণ আছে যে ড্রেন পরিষ্কারের দুদিনের মধ্যে আবার পলিথিন ভর্তি ময়লা দিয়ে ড্রেন ভরে ফেলা। দশ-বিশ তলা ভবনের চারপাশের উপর থেকে খুচরা ময়লা ফেলে এমন করে রাখে যে তাকানোর উপায় নেই। সামনের দিকে না ফেললেও বাকি তিন পাশে ময়লার খেলা। নিজেদের ব্যালকনি দিয়ে নিচে তাকালে নিজেরাই লজ্জা পাবে। আরও অভাবনীয় বিষয় হলো, বেশিরভাগ বাড়ির বাথরুমের সুয়ারেজ লাইন ড্রেনের সাথে সংযোগ দেওয়া। সে রকমভাবে দোকানদারেরা দোকান ঝাড় দিয়ে রাস্তায় ময়লা ফেলে, গৃহিণী ময়লা ডাস্টবিনে না ফেলে ড্রেনে ফেলে, শিশুরা চিপস-চকলেট খেয়ে রাস্তায় বা খালে ফেলে। সুতরাং সকল বর্জ্য যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর যারা ক্ষমতাধর নাগরিক তারা খাল দখল করে, পুকুর দখল করে, রাস্তার ট্রাফিক অমান্য করে, খাসরাস্তা বা জমিতে অবৈধ দোকান বা মার্কেট বসায়। সব মিলিয়ে নাগরিকদের অসহযোগিতা যেমন দৃশ্যমান, তেমনি নাগরিকেরা দায়িত্ব পালন করতে পুরোপুরি অনীহা প্রকাশ করে। সবাই সুন্দর নগরী চায়, কিন্তু কেউই সুন্দর আচরণ বা ম্যানার বজায় রাখে না। হ্যাঁ সরকার দায়িত্ব পালন করবে, নাগরিককেও দায়িত্ব পালন করতে হবে, সচেতন হতে হবে। অন্যথায় সরকার শতভাগ দায়িত্ব পালন করলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

একটি ঘরে ১০ জন সদস্য থাকে আর একজন কাজের লোক থাকে। সেখানে যদি ১০ জন ঘরের যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে, সবকিছু বিশৃঙ্খল করে রাখে এ আশায় যে কাজের লোক সব গোছাবে। তবে কাজের লোক যখন পরিষ্কার করবে বা গোছাবে, তখনই সেটা পরিষ্কার বা গোছানো থাকবে। বাকি ২৩ ঘণ্টা পুরো ঘর অপরিচ্ছন্ন ও অগোছালো থাকবে। পরিকল্পনা করে সাজানো, গুছিয়ে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্দিষ্ট ময়লা নেওয়ার ব্যবস্থা করা সরকারের কাজ। কিন্তু সেটাকে সার্বক্ষণিক সেভাবে রাখা ও সংরক্ষণ করাতে নাগরিকদের ভূমিকা বেশি।

নাগরিকদের মধ্যে আবার দুই ধরনের আছে। একদল সাধারণ, আরেক দল পাওয়ারফুল। পাওয়ারফুল নাগরিকগণ যদি সুনাগরিকের আচরণ না করে, তবে পরিচ্ছন্ন নগরীর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কারণ, পাওয়ারফুল নাগরিকরাতো ছোটখাটো নিয়মকানুন মানেই না, বরং বড় বড় অন্যায়ে যুক্ত হয়ে যায়। যেমন সকল খাল, নদী ও পুকুর দখল করা, রাস্তা-ফুটপাত-পার্ক-খাসজায়গা দখল করা, ট্রাফিক আইন না মানা, যত্রতত্র মার্কেট বসানো, সবকিছুতে চাঁদাবাজির আওতায় এনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। সুতরাং পাওয়ারফুল নাগরিকেরা

যখন পরিচ্ছন্ন নগরী গঠনে সহযোগিতা না করে বরং অনিয়মের বাজার বসায়, তখন সবকিছু গুবলেট হয়ে যায়। পাওয়ারফুল নাগরিকগণ নিজের স্বার্থে সবকিছু করে। এটাকে তাত্ত্বিকভাবে বলে রাজনৈতিক অর্থনীতি। মানে পাওয়ারফুল নাগরিক নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়।

পাওয়ারফুল নাগরিক বলতে রাজনীতিক, আমলা, মিডিয়া মালিক, আইনজীবী, শ্রমিক নেতা, এনজিও নেতা, সাংবাদিক নেতা, ধর্মীয় নেতা সকলকেই বোঝানো হয়। তারা যে কেবল জোরপূর্বক দখলদারি করে তা নয়, বরং স্লো-মোশনে দেশের আইন, বিধি, পরিপত্র ও নীতিমালাতে ভূমিকা রাখে। নগরীর মাস্টারপ্ল্যান পাস হবে কি না, কোন দিকে রুট যাবে, কোনখানে শিল্পকারখানা হবে, কোন শিল্প কোন এলাকায় স্থানান্তর হবে, নগর পরিকল্পনার ইতিউতি কী হবে, তা তারা ঠিক করে। উন্নয়নের নামে নগরীর নানান দিক নানান সিদ্ধান্ত তাদের প্রভাবের পরিকল্পনা দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। সেসব বাস্তবায়নে কখনো সরাসরি, কখনো গোপনে এই পাওয়ারফুল স্টেকহোল্ডার তথা নাগরিকগণ ভূমিকা রাখে। প্রতি ক্ষেত্রেই তারা এমন সিদ্ধান্ত নেয় বা এমন নীতিমালা বা বিধিমালা বানায় যাতে নদীদূষণ ঠেকানো, শিল্পবর্জ্য শোধন কিংবা পরিকল্পিত নগরীর আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যবর্ধন সুদূরপরাহত হয়। বিচার মানি তালগাছ আমার এর মতোই সুন্দর নগরী চাই তবে এদিকটাতে এ রকম হলে আমার ক্ষতি হবে তাই তা করা যাবে না–টাইপ সিদ্ধান্ত তারা চাপিয়ে দেয়। ডাস্টবিন লাগবে তবে আমার বাড়ির সামনে না, দখলকৃত খাল উদ্ধার করতে হবে তবে আমার দখল করা জায়গাটুকু না, দূষিত কালো পানি বন্ধ করতে হবে, তবে আমার কারখানাটিকে বাদ দিয়ে। তথা পাওয়ারফুল স্টেকহোল্ডারগণ নাগরিক হলেও সুনাগরিকের কর্তব্য পালনে পুরোপুরি অনীহা প্রকাশ করে। রাজনৈতিক অর্থনীতি তথা ডমিনেটিং স্টেকহোল্ডারদের দৌরত্ম্য ও স্বার্থের খেলায় ক্লিন সিটি বা স্মার্ট সিটি বিনির্মাণ কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন পরিচ্ছন্ন নগরী করতে করণীয় কী কী বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার মিলে মাস্টারপ্ল্যান করে নগরী সাজাতে হবে, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি নানান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারকে সুশিক্ষা প্রদান ও জনসচেতনতা তৈরির মাধ্যমে নাগরিকদেরকে অংশীজন করতে হবে প্রতিটি কাজে। তারপর শুরু হবে নাগরিকদের কাজ। নাগরিকগণ তাদের ময়লা-আবর্জনা ছোট কনটেইনার বিনে

জমাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে। আর সিটি কর্পোরেশন তাদের নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়মিত ডাস্টবিন থেকে ময়লা সংগ্রহ করে ল্যান্ডফিলে ফেলবে এবং পরবর্তীতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ কিংবা বর্জ্য থেকে গ্যাস উৎপাদন করে বর্জ্যকে জিরোতে রূপান্তর করতে হবে। নাগরিকের ঘর বা প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকারখানা থেকে সংগৃহীত বর্জ্য জিরোতে রূপান্তর হওয়া পর্যন্ত পুরো চেইনটাকে দাঁড় করানো সিটি কর্পোরেশনের বড় দায়িত্ব। সেখানে নাগরিকেরাও অংশীজন হয়ে সহযোগিতা করতে হবে, কর্তব্য পালন করতে হবে। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি কেবল নাগরিক কাজ করলে নগরী পরিচ্ছন্ন হবে না। কেবল সরকার কাজ করলেও নগরী পরিচ্ছন্ন হবে না। সরকার ও নাগরিক উভয়ে হাতে হাত রেখে পারস্পরিক আন্তরিকতা নিয়ে ভূমিকা রাখলে পরিচ্ছন্ন নগরী সময়ের ব্যাপারমাত্র। ইতোমধ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বেশ কিছু বিষয়ে সফলতার আলো দেখিয়েছে। অন্য সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সমস্যা ও লজিস্টিকের সাথে স্থানীয় অনুষঙ্গ বিবেচনা করে বাস্তবায়ন করলে প্রতিটি নগরীই সুন্দর হবে।

যখনই আমরা স্মার্ট সিটি বা ক্লিন সিটি বলব তখনই আমাদেরকে স্মার্ট নাগরিকও তৈরি করতে হবে। এমন সব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নিতে হবে যেখানে নাগরিকেরা অংশ নেবে, সুশাসনে এবং কর্মপদ্ধতিতে। সচেতন, তথ্যানুসন্ধানী ও শিক্ষিত সুনাগরিক গভর্নেন্সের ধাপে ধাপে অংশ নেবে। প্রথমত, ভোটে অংশ নিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে। সচেতনভাবে তথ্য সংগ্রহ করে যোগ্য প্রার্থীকে সততার সাথে নির্বাচিত করবে। এমন প্রার্থীকে নির্বাচন করবে, যার দ্বারা এলাকার উন্নয়ন টেকসই হবে। দ্বিতীয়ত, জনপ্রতিনিধিদের নগর পরিকল্পনার অনুষঙ্গগুলোতে নাগরিকগণ মতামত দেবে, সেবা প্রদানের ধাপ, সময় ও কষ্ট কমানোর ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার সভাগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিবে, বাজেট প্রক্রিয়াতে অংশ নেবে। আয় বাড়ানো ও ব্যয় সংকোচন ও অগ্রাধিকার খাতগুলোতে ব্যয়ের বিষয়ে নাগরিকগণ মতামত দেবে। তৃতীয়ত, সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ফরম পূরণ, অনলাইনের ব্যবহার, ওয়েবসাইট ব্যবহার, অনলাইন পেমেন্ট ফিডব্যাক দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি অংশ নেবে।

পরিচ্ছন্ন নগরী গঠনের ক্ষেত্রেও এ তিনটি পর্যায়ে নাগরিকদের মনেপ্রাণে অংশ নিতে হবে। স্থানীয় সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের। পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলা, আধুনিক ডাস্টবিন

সরবরাহ প্রয়োজনীয় স্থানে নির্ধারণ করা, প্রতিটি নাগরিককে সচেতন করা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করা থেকে সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে ল্যান্ডফিলে বর্জ্যকে বিদ্যুৎ উৎপাদান বা গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জিরোতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াতে সহযোগী স্টেকহোল্ডার হিসেবে নাগরিকদেরকে অংশ নিতে হবে। সব কাজ সরকার করবে আর নাগরিক যত্রতত্র ময়লা ফেলবে, এ ধারণা থেকে বের হতে হবে। ড্রেন, খাল ও নদীকে দখলমুক্ত রাখতে হবে আবার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

এখন মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হলো যে নাগরিকদেরদায়িত্বের কথা বারবার বলা হচ্ছে। সে নাগরিকদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বটি কার? সেটা নিশ্চয়ই সরকারের। সুতরাং সরকারকে সে রকম শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা তৈরি করতে হবে যেখানে নৈতিকতার মানদণ্ড, উচিত-অনুচিতের ধারণা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নাগরিকেরা শিশু বয়স থেকেই গ্রহণ করে। সে কারণে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সহশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে হবে। পাশাপাশি পিতা-মাতা ও শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারণ এবং বাস্তব জীবনে এসবের অনুশীলন প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে। কারণ, শিশু বাবা-মাকে দেখেই শেখে। বাবা-মা যেমন আচরণ করবেন, শিশুরা আগামীতে তেমন আচরণই করবেন। বাবা-মায়েরা যেন অনিয়ম ও অন্যায় করে পার না পান, সে রকম সুশাসন ও আইনের বাস্তবায়ন করে দেখানো সরকারের কাজ। দ্বিতীয়ত, ভোটার বা নাগরিকগণ কাদের দেখে উৎসাহিত হবে? নিশ্চয়ই জনপ্রতিনিধিদের দেখে। জনপ্রতিনিধিগণ যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, গণমানুষের অধিকার ও ভোগান্তির প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তবে নাগরিকেরাও সেটা অনুসরণ করবে। সুতরাং ভোটাধিকার, মানবাধিকার ও জনগণের মত প্রকাশ করার প্রয়োগের স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি গ্রহণ না করলে নাগরিকেরা সঠিক লোককে নির্বাচিত করতে পারবে না। এগুলো করা সরকারের কাজ। সঠিক লোককে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ না দিলে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হবে। যেখানে জনগণও জনপ্রতিনিধিকে সম্মান করবে না। তাঁর কথা শুনবে না। সুতরাং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, নগরীতে নগরীতে আইন না মানার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। নগরীকে বসবাস উপযোগী করার ক্ষেত্রে কারও কোনো আন্তরিক ভূমিকা থাকবে না।

জাপানে পড়ার সময় এক প্রফেসরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে জাপান দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধেও সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ছিল, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিলা। এ রকম নাজুক অবস্থা থেকে মাত্র ২০-৩০ বছরে অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত করতে পারার মূল কারণ কী ছিল? উত্তরে প্রফেসর বলেছিলেন যে দুটো বিষয় ছিল। এক. তখনো জাপানের শতভাগ লোক শিক্ষিত ছিল। কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, সত্যিকার শিক্ষিত। দুই. জাপানের সকল লোক একই জাতিগোষ্ঠীর, শঙ্কর নয়। যে কারণে যেকোনো বিষয়কে তারা গ্রহণ করে একইভাবে। এটার প্রমাণ পেয়েছিলাম একটি আর্টিকেল পড়ে। যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে জাপানিজ বাচ্চারা স্কুল টিফিন নেয় ও খায় এবং এর সাথে রাষ্ট্রের আইন মানার কালচার তৈরি কীভাবে হচ্ছে। জাপানের সব বাচ্চা একই নিয়মে স্কুলে টিফিন আনা-নেওয়া করে, একই নিয়মে খায়, একই সময়ে খায়, আবার একইভাবে টিফিন বক্স ধুয়ে বাসায় ফেরত নেয়। বাবা-মা ও শিক্ষকগণ এটা হুবহু বাস্তবায়ন করে আর বাচ্চারাও সেটাই একই রকম আচরণে মানে। কেউ নিয়মের কোনো অনুষঙ্গ মিস করে না এবং সে কারণেই তারা বড় হয়ে রাষ্ট্রের কোনো আইন বা প্রথাকে অমান্য করে না। অথচ বাংলাদেশের স্কুলের দিকে তাকালে দেখব যে কেউ টিফিন আনে, কেউ আনে না। যারা আনে তারা কেউ খায় কেউ খায় না, একেকজন একেক সময় খায়, কেউ আবার অর্ধেক খায়, কেউ আবার দোকান থেকে কিনে হাবিজাবি খায়। কেউ টিফিন বক্স ধুয়ে রাখে, কেউ রাখে না। এ রকম ভিন্ন আচরণকারী শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তারা আইন, বিধি, প্রথা না মানার সংস্কৃতিতে ধাতস্থ হয়ে যায়। এ রকম নাগরিকদেরকে একরকম আচরণের মতো করে গড়ে তোলা কঠিন কাজ।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাসঠাস। সুতরাং শিশুবয়স থেকেই বাচ্চাদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং এটা করতে হলে আমাদের বড়দের চলাফেরার কালচার যেমন সত্য বলা ও সততার সহিত উপার্জন তৈরি করতে হবে। আবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সে ধরনের কালচার (যেমন সুশাসন ও ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ) বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে করে আজকের শিশুরা কালকের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

নাগরিক ও জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার সকলে মিলেই নগরীকে পরিচ্ছন্ন করার কাজ করতে হবে। পরিবারের ক্ষুদ্র ইউনিট থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের বৃহত্তর পর্যায়েও তা বাস্তবায়ন করে করে প্রদর্শন করতে হবে। যাতে করে মানুষ গুড প্র্যাকটিসের মাধ্যমে সকলে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয় এবং আলোর দিকে ধাবিত হয়।

অগ্নিকাণ্ড : কায়দা করে দায় এড়িয়ে ফায়দা কী?

অস্ট্রেলিয়াতে ইউনিভার্সিটির বিশাল বিশাল ভবনে আমরা গবেষণাকাজে ব্যস্ত থাকতাম। কেউবা ক্লাসে বা সেমিনারে। হঠাৎ করে রুমের ভিতর অগ্নিকাণ্ডের সাইরেন বেজে উঠলে সবাই দৌড়ে বেরিয়ে যেত। রাস্তায় ও আঙ্গিনায় অনেক মানুষের ভিড়। পরে জানা যেত এটা এমনিতেই নিয়মিত চেকআপ। দেখা হয় সকল রুমে সাইরেন বাজে কি না ও সবাই বের হয় কি না। তবে মাঝেমধ্যে সামান্য স্মোক বা ধোঁয়া দেখা গেলেও এ রকম সাইরেন অটো বেজে উঠতো। সবাই তখন বের হয়ে যেত। ওই নির্ধারিত রুমের আগুন বা ধোঁয়া দ্রুতই নেভানো হতো। অন্য কারও ক্ষতি হতো না। জাপানেও এমনটা দেখেছি যে প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য বাচ্চাদেরকে নানান রকম ড্রিলিং করানো হয়। এসব করার অর্থ কী? কারণ হলো সবাইকে সচেতন করা, নিয়ম মানতে উৎসাহিত ও বিপদ থেকে রক্ষা পেতে রপ্ত করে তোলা। এসব করা হলে বেইলি রোডের এ অগ্নিকাণ্ডে এ রকম বড় সংখ্যার জানমাল হারাতে হতো না।

সংবেদনশীল মনের মানুষ হওয়ার যন্ত্রণা হলো প্রতিটি বিষয় নিয়ে ভাবা আর কষ্ট পাওয়া। শোকে মূহ্যমান হয়ে কেবল বেইলি রোডে অগ্নিশিখায় জ্বলন্ত ভবন ও বের হওয়া লাশদের কথা ভাবছি। ভাবছি স্বজনদের কথা। প্রথমেই প্রশ্ন আসে কারা দায়ী? যারা ভাবি ইলেকট্রিসিটি বা গ্যাসের লাইন নিয়ম না মেনেও নেওয়া যাবে; যারা ভাবি এসব ইউটিলিটির ক্যাবল বা পাইপ কম দামি মানহীন হলেও হবে; যারা ভাবি কিচেনের নিরাপত্তার জন্য আলাদা জনবল নিয়োগ করে বাড়তি খরচ করার দরকার নেই; যারা ভাবি ভবন নির্মাণে গুণগত মান বজায় রাখার দরকার নেই; যারা পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ভবনে রাখি না। যারা ভবনে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক রাখি না; যারা আলাদা সিঁড়ি ও বিকল্প এক্সিট

রাখি না। (অনেক ভবনেই কেবল সিঙ্গেল লিফট। বিকল্প এক্সিট নেই, এমনকি সিঁড়িও নেই।) যারা এসব নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত তদন্ত করা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থেকেও দায়িত্ব পালন করেন না, তারা দায়ী। যারা ইন্সপেকশনকারী কর্মকর্তাদেরকে ফোন করে তদবির করে ছাড় দিতে বলেন– সে সকল বড় সাহেব দায়ী। তাহলে কারা দায়ী নয়? কেবল বেইলি রোডের ওই ভবনের মালিক বা রেস্তোরাঁর মালিক দায়ী? না, সকল ভবনমালিক যারা এসব মানি না এবং সকল অফিস যারা মানানোর দায়িত্বে থেকেও মানাই না, আর সে সকল তদবিরকারী যারা এসব অন্যায়ের পক্ষে তদবির করেন, তাঁরাই এসব অগ্নিকাণ্ড ও হত্যার জন্য দায়ী। পরিহাসের বিষয় হলো যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের পরিবার, স্বজন ও আত্মীয়দের চেক করা হলেও দেখা যাবে তাদের অনেকেই বাড়ি, দোকান ও ইউটিলিটি-সংক্রান্ত বিধিবিধান মানেন না। না মেনে যারা আমরা ভাবছি জিতে গেলাম, তারাই আবার ভিকটিম হই। মোদ্দাকথা হলো, কায়দা করে দায় এড়িয়ে ফায়দা লাভের চেষ্টা করি বটে, তবে আখেরে লাভবান হতে পারি না। কারণ, আমরা যারা নিয়ম মানি না বা মানাই না, তারা কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই, নদীদূষণে, রোগেশোকে, অগ্নিকাণ্ডে, সড়ক দুর্ঘটনায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। তার মানে কায়দা করে দায় এড়িয়ে কোনো ফায়দা হয় না।

এখন করণীয় কী?

ক. ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট বা ফায়ার ফাইটিং বিষয়ে প্রতিটি নাগরিক সচেতন হওয়া ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সকল বিধিবিধান সঠিকভাবে মেনে চলা। অন্যদেরকে সচেতন করা ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

খ. বহুতল ভবন করার জন্য বিল্ডিং কোডসহ রাজউকের নির্ধারিত নিয়মকানুন রয়েছে। সেগুলো অনুপুঙ্খভাবে মানার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. রাজউক ছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসহ প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর যথাযথ তদন্ত করে ছাড়পত্র দিতে হবে। এসব ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না। বিশেষ করে রাজনৈতিক/ব্যবসায়িক/আমলাতান্ত্রিক/মিডিয়া/পেশাজীবী ঘরানার উচ্চমহলের কোনো তদবির করা বা তদবির গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। যেসব ভবনের অনুমোদন বা ছাড়পত্র নিয়ম না মেনে

দেওয়া হয়েছে, রাজউক ও অন্যান্য সকল সংস্থার সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. নিয়ম না মেনে যদি কেউ ভবন করে, সে ভবনে কোনো ইউটিলিটি তথা পানি, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশনের সংযোগ পাওয়ার কথা নয়, নিয়মবহির্ভূত ভবনে যেন কোনো সার্ভিস না দেওয়া হয়, সে বিষয়েও সকলকে সতর্ক হতে হবে।

ঙ. আধুনিক যন্ত্রপাতি, লজিস্টিকসহ আধুনিক ফায়ার সার্ভিস প্রস্তুত করা। একই সাথে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছাতে পারবে না। যানজটের কারণে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারায় বার্ষিক কতজনের মৃত্যু হয়– এই তথ্যও বিবেচনায় রাখতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, ব্যবসায়িক ও পেশাজীবী সংগঠন ও নেতৃবর্গকে সত্যিকার অর্থেই বিষয়টি অনুধাবন করে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।

অনেকেই উৎসুক জনতা নিয়ে সমালোচনা করে। নিশ্চয়ই অযথা ভিড় বা ভিডিও করা কাজের পরিবেশকে ধীরগতির করে, তবে উৎসুক জনতার অনেকে আবার জীবন বাজি রেখে ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতা করে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো এ মানবিকতার দিকটি আছে। এ রকম মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। পাশাপাশি নিজেরাসহ সকল স্টেকহোল্ডারকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা দরজা বন্ধ করবে, পানির পাত্রের মুখ বাঁধবে, পাত্রগুলো উল্টে রাখবে কিংবা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, বাতি নিভিয়ে দেবে। কেননা শয়তান বন্ধ দুয়ার খুলতে পারে না, মশকের গিঁট খুলতে পারে না, পাত্রের মুখও অনাবৃত করতে পারে না। (বাতি নিভিয়ে দেবে) কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলো লোকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়' (তিরমিজি-১৮১৯)। সুনাগরিকের কর্তব্য ভুলে, ফাঁকি দিয়ে জিতে যাওয়ার লোভে, এখন আমাদের অনেকেই আত্মঘাতী ইঁদুরের ভূমিকা নিয়েছে। নিজেদের তৈরি করা ফাঁদে আমরাই পড়ি ও জানমাল হারাই। অনেকেই অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে দায় সারাতে চাইব, শক্তিশালী স্টেকহোল্ডারগণের একটি অংশ এসব প্রকৃতির খেলা বা সৃষ্টিকর্তার খেলা বলে চালিয়ে দেবে কিংবা "তাদের মৃত্যু এভাবেই লেখা ছিল" বাণী আওড়ে গা ভাসাবে। কিন্তু সমঝদারমাত্রই বোঝার কথা, নিজেদের তৈরি

করা গর্তে আমরা পা দিচ্ছি। আমরা নিজেরা মৃত্যু ডেকে আনছি। আমাদের অবহেলা, অনিয়ম, জবাবদিহির অভাব, দায়িত্বশীলতার অভাব, আমাদের পরিশীলিত চিন্তার অভাব, আমাদের লোভ এ সকল ঘটনার জন্য দায়ী। 'আমার দ্বারা অন্য মানুষের কোনো ক্ষতি হবে না বা অন্যরা কোনো ঝুঁকিতে পড়বে না' এ বোধে উজ্জীবিত হওয়ার মতো সংবেদনশীল মনন আমাদের সকলের দরকার।

(দৈনিক *ডেইলি স্টার* বাংলায় ২০২৪ সালের ১ মার্চে প্রকাশিত)

করোনা পরিস্থিতি : মাঠ প্রশাসন কী করেছে?

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি মানুষ নানান প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে অধিকার রক্ষার যুদ্ধে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষকে যারপরনাই জানমালে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। এসব যুদ্ধে সব মানুষ সামনের কাতারে এগিয়ে যায় না, প্রাণ বাজি রেখে কাজ করে না। যারা করেছে তাঁদেরকেই ইতিহাস মনে রেখেছে ও 'বীর' উপাধি দিয়েছে। বর্তমান করোনা সংকটেও নানান পেশার মানুষ ফ্রন্টলাইনে থেকে লাখো মানুষের প্রাণ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে ডাক্তার নার্সরা হাসপাতালে, মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তারা দেশের জেলা-উপজেলার আনাচেকানাচে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা কাজ করছে মাঠে-ঘাটে আর খাদ্য ও জরুরি সরবাহকারী কৃষক ও শ্রমিকেরা সর্বত্র। আর পলিসি প্রণয়ন ও দেশব্যাপী দুর্যোগ মোকাবিলায় সমন্বয়ের কাজ করছে সরকারের নির্দেশনায় জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক আমলারা। সম্মুখভাগে যুদ্ধরত ডাক্তার, নার্সদেরকে আমরা হাসপাতালে গেলে দেখি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরও পোশাকের কারণে রাস্তাঘাটে কর্মতৎপরতায় দেখতে পাই। বাংলাদেশের প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যরাসহ সিভিল আমলারাও কাজ করে যাচ্ছেন। নীরবে, নিভৃতে সকল দুর্যোগের মতো এ করোনা সংকটেও।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা। সিভিল সার্ভিসের অনেক কর্মকর্তাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। রাঙামাটি ও যশোরের তৎকালীন প্রশাসকগণ, হবিগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক ড. আকবর আলী খান, সদ্য প্রয়াত সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব ড. সাদত হুসাইন প্রমুখসহ আরও অনেকে। তেমনি পরবর্তীতে প্রতিটি দুর্যোগে এ আমলারা জীবন বাজি রেখেই কাজ করে গিয়েছেন। অনেক খবর ঘাঁটলে পাওয়া যাবে, তবে আমলারা এসব বলার পেছনে সময় না দিয়ে কেবল নীরবে কাজ করে গেছেন সবকালে। "বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়" কিংবা "বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু"

হৃদয়ে রেখে, "পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলি দাও, তার মতো সুখ কোথাও কি আছে, আপনার কথা ভুলিয়া যাও" কবিতার লাইন মননে গেঁথে, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে, পেশাদারত্বের সাথে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে বিসিএস প্রশাসনসহ সিভিল সার্ভিসের অনেক সদস্য।

এ রকম হাজার হাজার কাজ থেকে করোনা সংকটে নেওয়া কিছু কাজের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। গ্রামবাসী যেখানে করোনা রোগীকে গ্রাম থেকে বের করে দিচ্ছেন সেখানে সখীপুরের ইউএনও দিলেন 'মমতার দাওয়াই' (*প্রথম আলো*, ২৫ এপ্রিল), কোটালীপাড়ায় তরমুজ বিক্রি করতে না পারায় তরমুজ যখন পচার উপক্রম তখন ইউএনও অনলাইনে tarmuzbazar.com খুলে তা বাজারদরে সারা দেশে বিক্রির ব্যবস্থা করলেন (*সমকাল*, ২৭ এপ্রিল), কৃষকের কৃষিপণ্য ফল-সবজি বাজারদরে কিনে তা ত্রাণ হিসেবে পৌঁছে দিচ্ছে খুলনা জেলা প্রশাসন (*বিডি-প্রতিদিন*, ২৩ এপ্রিল), ত্রাণ বিতরণে স্বচ্ছতা আনতে ও পুনরাবৃত্তি কমাতে মোবাইল অ্যাপসের ব্যবহার করছে খুলনা জেলা প্রশাসন (*সমকাল*), বিলাইছড়ি উপজেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবজি বীজ বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন (*ডেইলি স্টার*, ২২ এপ্রিল), হবিগঞ্জে ১৫০০০ করোনা বেকারকে ধান কাটানোর কাজে লাগিয়েছেন, উপজেলা প্রশাসন বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে (*প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল), কাউখালী উপজেলা প্রশাসন ভ্রাম্যমাণ বাজার চালু করেছে, করোনা আক্রান্ত রোগীকে সরকারের পক্ষ থেকে ফুল ও ফল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে মনপুরার উপজেলা প্রশাসন, ওএমএসের চাল যেন ডিলাররা বাইরে বিক্রি করতে না পারেন, সে জন্য কালিহাতী উপজেলার ইউএনও করেছেন ডিজিটাল কার্ডের ব্যবস্থা, উপজেলায় কর্মরত কৃষিশ্রমিকদের দুপুরের খাবার দিচ্ছেন জুড়ি উপজেলার ইউএনও। এ ছাড়া ইউএনওদের আহ্বান ও সমন্বয়ে হাজার হাজার শ্রমিক কৃষককে ধান কাটায় সহযোগিতা করছে হাওরের বিভিন্ন উপজেলায়। পাশাপাশি করোনায় মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়ানোর জন্য যখন স্বজনদের পাওয়া যাচ্ছে না তখন ঝিনাইদহ সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজেই জানাজা পড়িয়েছেন, সেই উদাহরণও রয়েছে আমাদের চোখের সামনে। এসব বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত খবরের কয়েকটি, অপ্রকাশিত রয়ে গেছে আরও হাজার উদাহরণ।

উল্লিখিত প্রতিটি কাজই প্রমাণ করে যে মাঠ প্রশাসন এখন জনগণের সমস্যা বুঝে সমাধান দিচ্ছে, প্রমান করে যে মাঠপ্রশাসন এখন গণমুখী ও পেশাদারি। এসব কাজ প্রমাণ করে ম্যাক্স ওয়েবারের টপ-ডাউন অ্যাপ্রোচের আমলাতন্ত্র

থেকে বেরিয়ে এসে প্রশাসন এখন আধুনিক বটম-আপ অ্যাপ্রোচে কাজ করছে এবং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে জনগণের দোরগোড়ায়। উপরের সব কাজই প্রমাণ করে যে মাঠ প্রশাসন রবীন্দ্রনাথের বাণী ("যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই, সেখানে ব্যুরোক্রেসি উঁচুদরের জিনিস হইতে পারে না") থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। আর দীক্ষা নিয়ে জনগণকে সামনে রাখছেন, জনগণকে দেখছেন, জনগণকে শুনছেন এবং তাদের প্রয়োজনের আলোকে জরুরি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। থাকছেন সেবক হয়ে জনগণের জানমালের নিরাপত্তায়।

এসব কাজের অংশ হিসেবেই লকডাউনকে বাস্তবায়ন করার জন্য শুরু থেকেই দৌড়ঝাঁপ করছেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গ্রামের হাটবাজারে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে মানুষকে সচেতন করছেন, মাইকিং করছেন ও প্রয়োজনমতো আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মানুষকে ঘরে রাখতে দিনরাত খেটে যাচ্ছেন। নাওয়াখাওয়া ভুলে, বিনিদ্র রজনী পার করে, শিশু সন্তান ও পরিবারকে বিচ্ছিন্ন রুমে রেখে। আর এসব কর্মযজ্ঞ চালাতে গিয়ে বিসিএস প্রশাসনের অর্ধশতাধিক কর্মকর্তা আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়, আর একজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া শতাধিক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছেন এ পর্যন্ত।

এরপরেও মূল মিডিয়াতে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমলাদের নিয়ে নানান কুৎসা চলতেই থাকে। সমাজে যেমন সকল মানুষ ফেরেশতা না, তেমনি আমলা সমাজেও দু-একজন ভুলের ঊর্দ্ধে নয়। তবু নেতিবাচক সমালোচনা, অরুচিকর সমালোচনা চলতে থাকে জেনারালাইজড করে। এসব সমালোচনা সহ্য করে পেশাদারত্ব ও দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করার মনোবল ও দক্ষতা প্রশাসনের রয়েছে। প্রশিক্ষণ ও দেশপ্রেমেই তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে সব সহ্য করে নীরবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এরপরেও কোনো কোনো অনুজ কর্মকর্তার মনে কষ্ট থাকতে পারে বা মনোবলে আঘাত পড়তে পারে, তাদের জন্য একটি গল্প স্মর্তব্য। গল্পটি ছোটবেলায় আমার নানার মুখ থেকে শোনা।

এক গৃহস্থ তিনজন দিনমজুর ভাড়া করেছে। জমির আগাছা পরিষ্কার করতে। তিন দিনমজুরের নাম মামলা, ঝামেলা আর কামলা। এদের একজনের নাম কামলা। তিনজন সারা দিন কাজ করেছে। কাজ শেষ। এবার জামির মালিক বিকেলে জমি দেখতে এসেছে কেমন পরিষ্কার হলো। দেখে জমির এখানে

ওখানে কিছু আগাছা দেখা যায়। জমির মালিক প্রশ্ন করে এ জায়গাটা কে পরিষ্কার করেছে? প্রথম দুজনে উত্তর দেয় কামলা করেছে। আরেকটু দূরে গিয়ে আবার প্রশ্ন এ জায়গাটা কে পরিষ্কার করেছে? দুইজনে উত্তর দেয় কামলা করেছে। এভাবে সারা জমি হেঁটে হেঁটে যেখানেই আগাছার চিহ্ন পেয়েছে, প্রশ্ন করেছে এ জায়গাটা কে পরিষ্কার করেছে? প্রথম দুজন উত্তর দিয়েছে কামলা করেছে।

তো সন্ধ্যায় টাকা পরিশোধের বেলায় গৃহস্থ কামলার হাতে তিন জনের দিনের মজুরি তুলে দিল। অন্য দুজন কোনো টাকা না পেয়ে গৃহস্থকে ধরল। গৃহস্থের নির্বিকার উত্তর। তোমরা তো বললে সারা জমি কামলা পরিষ্কার করেছে। সারা জমিতেই একটু-আধটু আগাছা ছিল। মানুষ কাজ করলে কিছু ভুল হতেই পারে। যেহেতু কামলা সারা জমিতে কাজ করেছে, তাই কামলাকে সব বেতন দিয়ে দিলাম। গল্পের শিক্ষা হলো– এ রকম তিনজনে মিলে অনেক জায়গায় আমরা কাজ করি। ঘরে, পরিবারে, গ্রামে, সমাজে, রাষ্ট্রে বিশ্বে। যে বেশি কাজ করে তার কিছু খুঁত থাকবেই, না থাকলেও লোকে বলবেই। যারা কাজ করে না, তাদের তো কাজই নেই, খুঁত কোথায় পাবে? তাই তারা অন্যের কাজের খুঁত ধরে বেড়ায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমলাদের সমালোচনা করলেও আমলারা মুখ খোলে না কেন? কারণ, আমলাদের প্রশিক্ষণ আছে কথা না বলার ও মুখ না খোলার। এবং তাদের মনে হয় সেই জোকসটা জানা আছে। এক জরিপে দেখা গেছে যে বিশ্বের ১০ ভাগ পুরুষ মতামত দিয়েছে যে তারা তাদের বউয়ের সমালোচনায় বিরক্ত, আর বাকিরা? বাকি ৯০ ভাগ পুরুষ বউয়ের ভয়ে মুখ খোলেনি! এ জোকস মনে রেখেই হয়তো তারা মুখ খোলে না। 'কথা কম কাজ বেশি, দেশের জন্য কাজ করি' স্লোগানই তাদের চলার শক্তি।

তাহলে কি প্রশাসনের কোনো ঘাটতি নেই? নিশ্চয়ই আছে। গঠনমূলক সমালোচনা থেকে শিক্ষা নিতে পারে, আবার আত্মোপলব্ধি ও আত্মমূল্যায়ন থেকেও শিক্ষা নিতে পারে। বহির্বিশ্বের উন্নত ব্যবস্থা দেখে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশকে, সিভিল সার্ভিসকে, সেবা প্রদানের পদ্ধতিগুলো বিশ্বমানের করতে কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। বিদ্যমান উত্তম উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টাগুলোকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং ত্রুটিবিচ্যুতিগুলোকে সংশোধন করে এগিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করে করে আমলাতন্ত্রের গণমুখী ও সেবামুখী চরিত্রের বিকাশ করতে হবে। দেশের উন্নয়নে ও নাগরিকদের সেবায় ঐকান্তিক এসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর।

সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের নিজের অবস্থান কী?

১.

এক বছরে সারা বিশ্বে ক্ষুধায় মারা যায় ১৫ হাজার, আত্মহত্যায় ২ লাখ, সড়ক দুর্ঘটনায় আড়াই লাখ, নেশা করে ৮ লাখ, রাজনৈতিক বা ধর্মযুদ্ধে ১০ লাখের বেশি। কিন্তু করোনায় মাত্র তিন হাজার, তবু করোনায় আতঙ্ক বেশি। করোনার সমাধান জানি না, অন্যগুলোর প্রতিকারপথ আমরা জানি। তাহলে কী দাঁড়াল?

যেসব বিষয়ের সমাধান বা প্রতিকার আমরা জানি, তা বাস্তবায়ন না করে আমরা তাতে নিজেকে সঁপে দিই। আর যেসব বিষয়ের প্রতিকার বা সমাধান আমরা জানি না, সেসব বিষয়ে হুদাই আতঙ্কে থাকি আর দুনিয়ার টাকা ঢালি। সড়ক দুর্ঘটনার সমাধান বা প্রত্যেকের করণীয় সবাই জানি, তবু করোনার জন্য যতটা সিরিয়াস ইচ্ছা ও ফান্ডিংয়ের উদারতা ছিল, সড়ক দুর্ঘটনার জন্য তা নেই।

২.

প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন সিন্ডিকেট রয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো খুঁজলেও এ রকম সিন্ডিকেট পাওয়া যাবে। সিন্ডিকেটকে দমানো খুবই কঠিন কাজ। গার্মেন্টসে আগুন, গার্ডার দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা, ফরমালিন আমদানি ও অপব্যবহার, সর্বত্র মাদক ইত্যাদির পেছনে কারা? এরা লুটেরা শ্রেণি, এরা এলিট, এরা কোটিপতি, এরা অতি মুনাফালোভী, এরা আইনের উর্দ্ধে, এরা কথিত ও স্বীকৃত ভদ্রলোক। সুতরাং সহজ কোনো সমাধান নেই। এ কারণেই দেখা যায় যে সচিব, মন্ত্রী, আমলা, এসপি, ওসি, বিআরটিএ ইন্সপেক্টর, নেতা, পেশাজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণির লোকই সড়ক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরপরও আমরা জাগিনি। মোটরযান আইনে মোবাইল কোর্ট করতে গেলেই প্রচুর ফোন আর তদবির পাওয়া যায়। পরে ফোন বন্ধ করেই কাজ করতে হয়। অদক্ষ ও

অবৈধ ড্রাইভার আর অবৈধ গাড়ির পক্ষে যাঁরা তদবির করেন বা ছেড়ে দিতে বলেন, তাঁদের প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া কিছু বলার নেই।

৩.

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এমনকি লেখকেরাও অন্য লেখা ছেড়ে দিয়ে এ নিয়ে আলোচনা করে। মানুষ লেখালেখি না পড়লেও গরম গরম আলোচনা শুনতে ভালোবাসে। তাহলে লেখক কেন লিখবেন। অন্য যেকোনো কাজই তো লেখার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, আপনি টাক নিয়ে একটা ছড়া লিখছেন। এই সময় একজন আপনাকে ফোন করলেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা। আপনি বললেন, আমি একটা ছড়া লিখছি। তিনি বলতেই পারেন, রোজ বাংলাদেশে ৬০ জন মানুষ মারা যায় সড়ক দুর্ঘটনায়। আমরা যদি একটা দুর্ঘটনা রোধ করতে পারি, পাঁচটা লোকের জীবন বাঁচবে। আপনি ঠিক করুন এখন আপনি টাক নিয়ে কবিতা লিখবেন, নাকি ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনা রোধের আলোচনা করবেন। পৃথিবীর অন্য যেকোনো কাজ লেখালেখির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা যদি আপনি জেনে যান, তাহলে আপনি আর লেখক হতে পারবেন না। তাই বাংলাদেশে লেখালেখি বা সাহিত্য কম। বরং আলোচনা বেশি। এমনকি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়েও আলোচনা বেশি। কিন্তু কাজের বেলায় কেউ নেই। লেখকও নেই, অলেখকও নেই। যার যেটা করা উচিত সে তা করছে না, লেখকের লেখা উচিত লেখেন না। আর সড়কবিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের কাজে নামা উচিত, তারা কাজে নামছে না। আপনাকে এই রকমের একটা বিশ্বাস ধারণ করতে হবে যে আপনি এই কবিতাটা, এই ছড়াটা না লিখলে বা আপনি এই ছবিটা না আঁকলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনার লেখাটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেই লেখা ভালো হবে। আর সড়কবিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের ভাবতে হবে যে তাদের পরিকল্পনা করা ও কাজে নামা মানে মানুষের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান। তবেই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ হবে।

৪.

জাপানে ট্রেনে চলাকালে ড্রাইভারকে খেয়াল করতাম। এক স্টেশন থেকে ছাড়ার আগে-পরে-মাঝে সে দাঁড়িয়ে দুহাত প্রসারিত করে, আবার এক হাত নাকের কাছে নিয়ে মেলে ধরে, আবার কাঁধে ছোঁয়ায়, আবার দরজায় আসে,

আবার চালকের আসনে যায়।

তথা তার গতিবিধি, নড়নচড়ন, চাহনি, আর হাতপা ছোড়া দেখলে যে কেউ বলবে– যে পাগল মনে হয়। হাফ-মেন্টাল নাকি? পরে অনেকদিন খেয়াল করে বুঝলাম যে এসব সে বারবারই করে প্রতি স্টেশনের আগে-পরে-মাঝে এবং খুবই সিস্টেমেটিক ওয়েতে। এর সাথে ট্রেন থামানো, সিগন্যাল ধরা বোঝা, দরজা খোলা ও বন্ধ করা সব কানেকটেড।

বিষয়টার কারিগরি দিক আমি জানি না। তবে এটুকু বুঝলাম যে কোনভাবেই যেন চালক বেখেয়াল না হয়, কোনোভাবেই যেন সে ভুলোমনা না হয়, কোনোভাবেই যেন তার হাতের কাজে চোখের দেখায় কোনো কিছু মিস না হয়, সে কারণে সে নিয়ম করে এটি করতে থাকে। তাতে করে তার শরীর-মন-হাত-পা-চোখ-মাথা একনিষ্ঠ হয়ে জিরো ডিফেক্টে কাজ করতে পারে।

এ জন্যই তারা জাপানি।

৫.

আমাদের দেশে চালকগণ এ রকম সিরিয়াসনেস নিয়ে গাড়ি চালান না। আর সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সেভাবে চালকদেরকে প্রস্তুত করছেন না। ট্রেনিং, বিশ্রাম, বেতন ইত্যাদি দিচ্ছে না। মোটিভেশন বা সচেতনতাও নেই। ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলে রাস্তাঘাটে। তাই প্রতিবার দুর্ঘটনা ঘটে আর দুর্ঘটনায় নিহতদের কথা ভেবে খুব কষ্ট পাচ্ছি। চালক বা স্টেকহোল্ডারদের কারও কোনো অবহেলা আছে কি না, তা বিশদভাবে খতিয়ে দেখা দরকার, এ কথা বলেই আমরা ক্ষান্ত হই। কাজের কাজ কিছু করি না।

সবাই তো বলে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কে কাজ শুরু করবে, উদাহরণ তৈরি করবে। শুরু হোক আমার থেকে, আমার ঘর থেকে।

গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা ও বাস্তবতায় ফারাক কেমন?

প্রতিটি গণ-অভ্যুত্থানের পরপরই তরুণ প্রজন্ম ও ছাত্র-জনতার আকাশ পরিমাণ প্রত্যাশা থাকে, যা পূরণ না হওয়ায় তাদেরকে সর্বস্ব হারানোর মতোই হতাশায় নিমজ্জিত হতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে আমরা যখন নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখনো ক্যাম্পাসে অনেক বড় ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হতো যারা '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছিল বা সরাসরি জড়িত ছিল। তাঁদের কথাবার্তায় তেজ ছিল, '৮৫-৯০ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে গল্প বলার সময় চোখ দিয়ে স্ফূলিঙ্গ বের হতো এবং সফলতার আনন্দে তারা গর্ব অনুভব করত। কিন্তু গল্প বলার শেষ দিকে বা আড্ডার শেষ দিকে কিছুটা ম্রিয়মাণ হয়ে হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকত আর বসে থাকত। কারণ, তারা তখনো কোনো পেশায় বা চাকুরিতে বা ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারেনি এবং সেই ভাইদের দেওয়া তথ্যমতে '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের আন্দোলন ও সমর্থনে লক্ষ লক্ষ ছাত্র দেশব্যাপী জড়িত ছিল। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা '৯০-এর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল বা কর্মী ছিল বা সমর্থন দিয়েছিল, তারা সেশনজটের শিকার হয়েছিল কিংবা পড়াশোনার বয়স পেরিয়েছিল। এর মধ্যে হয়তো শতকরা ১ ভাগ রাজনৈতিক নেতা হয়ে পদ বাগিয়ে নিয়েছে, শতকরা ১ ভাগ কোনো না কোনো ব্যবসা বা ঠিকাদারির পথ বেছে নিয়েছে, শতকরা ১ ভাগ বাপের টাকায় ব্যবসায় বা বিদেশে পাড়ি দিয়েছে, শতকরা ১ ভাগ হয়তো বাউল বা আর্টিস্ট বা লেখক হয়েছে, শতকরা ১ ভাগ হয়তো অ্যাকটিভিস্ট বা বুদ্ধিজীবী হিসেবে থেকে গেছে, শতকরা ২০ ভাগ যারা পড়াশোনায় মনোযোগী ছিল নিজের চেষ্টায় চাকুরি জুটিয়ে নিয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৭০ ভাগ কোনো চাকুরি বা পেশা বা কর্ম জোটাতে পারেনি। এই

৭০ ভাগ শিক্ষার্থীর অনেকেই তখন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থাকত বা ঘুরত, আর বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বিষাদের জীবন পার করত।

২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদেরও এমন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে যদি না তারা সময়ানুগ সিদ্ধান্ত নেয় ও কর্মে প্রবেশের প্রচেষ্টা না করে। কারণ, এমনিতেই তারা নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটাবিরোধী আন্দোলন, করোনা মহামারি ইত্যাদি কারণে পড়াশোনায় পিছিয়েছে। সবশেষ গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে মিছিল, মিটিং, অ্যাকটিভিটি করতে করতে পড়াশোনার টেবিলে বসার সময় পায়নি। ফলাফলও আশানুরূপ হয়নি। এটা তো বাস্তবতা যে দেশে বা বিদেশে যেকোনো প্রতিষ্ঠান কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একাডেমিক রেজাল্ট দেখে, তারপর পরীক্ষা নিয়ে মেধা যাচাই করে। সেখানে নতুন প্রজন্ম তথা ছাত্র-জনতা কতটা এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে– এ নিয়ে ভাবা দরকার। বিশেষ করে '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের বড় ভাইদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই পড়াশোনায় বা স্কিলে বা কর্মযজ্ঞে নেমে পড়া উচিত। সময় নষ্ট করার মতো সময় তরুণদের হাতে নেই। তাদেরকে এখনই ঠিক করতে হবে তারা কী হতে চায়। রাজনীতিক হতে চায়, নাকি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মী হতে চায়, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী হতে চায় নাকি চাকুরিজীবী, নাকি পেশাজীবী, ব্যবসায়ী হতে চায়। দেশ ও সমাজের ভবিষ্যতের পাশাপাশি নিজেদের ভবিষ্যৎও ঠিক করে স্বপ্ন দেখে সেভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ছাত্র-জনতা অসাধ্যকে সাধন করেছে। তারা একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সমাজ, গণতান্ত্রিক দেশ ও সংবিধান, অন্যায় ও অবিচারমুক্ত ন্যায়বিচারের বাংলাদেশ গড়ার ভিত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গণমানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে বা সংস্কারের পথপরিক্রমা এনে দিয়েছে। এ জন্য জাতি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেই। কিন্তু সেটা তো জাতীয় অর্জন বা সামষ্টিক এচিভমেন্ট। প্রতিটি ছাত্র এখন বয়স বেড়ে বেড়ে তরুণ হবে, তখন তাদের জন্য কর্মসংস্থান জরুরি। কারণ, তারা যদি কর্মবিমুখ হয়, যদি আয় না থাকে, তাহলে সে পরিবারের বোঝা হবে। পরিবারের বোঝা হলে সমাজের বোঝা হবে, সমাজের বোঝা হলে রাষ্ট্রেরও বোঝা হবে। সুতরাং এ আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা তথা তরুণ প্রজন্মকে প্রতিটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্মের পথে এগিয়ে দিতে হবে। সবচাইতে বড় বিষয় হলো, তরুণ প্রজন্ম নিজেই নিজের কর্মপথ নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও পরিশ্রম করে আদায় করে নিতে হবে। পেটে ভাত না থাকলে

কেবল কথা দিয়ে জীবন চলবে না। যে আন্দোলন করে তারা গর্বিত ইতিহাসের অংশ হয়েছে, সে রকম মনোযোগ, পরিশ্রম দিয়ে নিজ নিজ পেশা বা ব্যবসায় বা পড়াশোনায় তাদের উন্নতি লাভ করতে হবে। অন্যথায় একসময় তারা হতাশায় নিমজ্জিত হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকলে তা থেকে হতাশার জন্ম নিতে পারে এবং হতাশা থেকে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের জন্ম হতে পারে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু মহলে হতাশার সুর শোনা যাচ্ছে। এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের যারা ফেল করেছে, তারাও আন্দোলন করে অটো গ্রেড চাইছে। আন্দোলন করে অটো গ্রেড অটো চাকুরি হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু পড়াশোনার ভিত্তি না থাকলে কর্মক্ষেত্রে ভালো করা যায় না। শ্রমজীবী কাজ হয়তো সম্ভব, কিন্তু মেধা ও দক্ষতা যেসব কাজে লাগে সেসব গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা যেতে সক্ষম হবে না। এই জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বাস্তব চরিত্র ও তৎপরবর্তী আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলো সমাধানে ইতোমধ্যে সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংবিধান, নির্বাচন কমিশন, দুদক, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের সংস্কারের পাশাপাশি আর্থিক খাত ও শিক্ষা সেক্টরকে পুনর্গঠনে কাজ শুরু হয়েছে। এসব সংস্কার কমিটি থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়িত হলে নিশ্চয়ই দেশে গণতন্ত্র যেমন বিরাজ করবে, তেমনি উন্নয়নের পথও সুসংহত হবে। সেটা হলে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-জনতা ও তরুণ প্রজন্ম গর্ব বোধ করবে। জাতীয় জীবনে ভূমিকা রাখতে পারা ও গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারার অংশ হওয়ার মতো আত্মসন্তুষ্টি আর কিছুই হতে পারে না। তবে এর সাথে সাথে নিজের ভাগ্যও একটু শান্তির ও স্বস্তির হওয়া জরুরি। জাতীয় পর্যায়ের এ পরিবর্তনগুলো হতে সময় লাগবে। তত দিনে ছাত্র ও তরুণ প্রজন্মের কর্ম শুরুর ও দক্ষতা অর্জনের সময় পেরিয়ে যাবে। তখন তারা পেশা, চাকুরি, ব্যবসা বা আয়ের পথ না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হতে হবে। গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে তরুণ প্রজন্ম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে। মানসিক চাপ বা হতাশা তাদের ক্যারিয়ার বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ কারণে তাদের নিয়ে রাষ্ট্রকে যেমন চিন্তা করতে হবে, তেমনি তরুণদেরকেও এখনই সচেতন হয়ে ফোকাস করে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে এখনই ভাবতে হবে।

প্রথমত, গণ-অভ্যুত্থানের সময় এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে শিক্ষাব্যবস্থায় স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে বের হতে হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে ত্বরান্বিত করে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রশাসনের আন্তরিকতায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করাতে হবে ও পাঠক্রম শেষ করতে হবে। সকল সেশনজট নিরসন করে পরীক্ষা সম্পন্ন করে ছাত্রদেরকে যথাসময়ে গ্র্যাজুয়েট করার কাজটি করতে হবে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করে তা দ্রুত শেষ করতে হবে, যেন কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীরা সরকারি সেক্টরে নিজেদের নিয়োগের সুযোগ পায়।

তৃতীয়ত, কর্পোরেট সেক্টরের সকল শিল্পকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সকল সেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজের পরিবেশ বিদ্যমান রাখা ও শূন্য পদে নিয়োগ সম্পন্ন করানো এবং নতুন নতুন সেক্টর সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসৃজনের পন্থা বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি কর্পোরেট সেক্টরের সকল মালিক, উদ্যোক্তা ও নেতৃত্বদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাড়াও যেসব কারিগরি ও বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করে থাকে, তারা তরুণ শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশকে স্কিল দেওয়া ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে জব মার্কেটের জন্য প্রস্তুত করতে পারে। বিশেষ করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও যুব অধিদপ্তর এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

পঞ্চমত, তরুণ শিক্ষার্থী যারা দেশের ক্রান্তিলগ্নে বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে জীবন বাজি রেখে '৭১-এর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছে, তারা একটু মনোযোগী হলে ও দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা করলে যেকোনো ব্যবসায়, পেশায় সফল হতে পারবে বা মেধার প্রমাণ রেখে চাকুরিও জুগিয়ে নিতে পারবে। সরকার ও কর্পোরেট সেক্টরের পাশাপাশি তরুণ শিক্ষার্থীদেরকেও স্বপ্ন দেখতে হবে, একাগ্র হয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে টানা পরিশ্রম করে যেতে হবে। তবেই তারা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নিজের জীবন সুন্দর রাখার পাশাপাশি দেশ গঠনেও ভূমিকা রাখতে পারবে।

ষষ্ঠ, দেশের অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করে ব্যাংক ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে শক্ত ভিতে দাঁড় করাতে হবে। চাকুরি ও বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করে তরুণ

ও নতুন উদ্যোক্তাদেরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। তরুণদের উদ্ভাবন ও সৃজনশীল চিন্তার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। স্টার্টআপ বা উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে।

সপ্তম, গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তীতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে বা ঘটবে। অনেক ক্ষেত্রে নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ ও চাহিদা তৈরি হতে পারে। তরুণদের উচিত সেই অনুযায়ী নতুন দক্ষতা অর্জন করা। টেকনোলজিক্যাল স্কিল যথা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডেটা সায়েন্স, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করা; কৃষিভিত্তিক দক্ষতা যথা কৃষি বা গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত হবে এমন কৃষি প্রযুক্তি বা অ্যাগ্রিবিজনেস-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা; ফ্রিল্যান্সিং যথা ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মে কাজ করে আয়ের সুযোগের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়।

অষ্টম, গণ-অভ্যুত্থানের পর তরুণদের অনেকে সামান্য চাকুরি-ব্যবসা না করে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে উৎসাহিত হতে পারে। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তোলার জন্য বা সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে তারা সমাজে সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। গণ-অভ্যুত্থান যেসব সমস্যা সমাধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব সমস্যা সমাধানেও নতুন প্রজন্ম ভূমিকা রাখতে পারে। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, নৈতিকতা এবং মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় তারা অংশ নিতে পারে। তরুণদের মধ্যে এই মূল্যবোধগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়, সে বিষয়ে সরকার ও সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। যাতে সমাজে ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে জড়িত হয়ে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

নবম, তরুণ শিক্ষার্থীদের যারা রাজনীতিক হতে আগ্রহী, তারা রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত হতে পারে। গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল যেন তরুণদের রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত করে, সে রকম পথ বের করতে হবে। তরুণেরা রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো মজবুত হবে এবং জনগণের চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। বৈশ্বিক চিন্তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে তরুণদের বিকাশকে ত্বরান্বিত করা যায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতার সুযোগের মাধ্যমে তারা বিশ্বমানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

মোটকথা, গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী তরুণদেরকে এখনই সচেতন হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে, দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দক্ষতা রপ্ত করতে হবে। যাতে করে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের পেশা বা কর্মে বা জীবনযাত্রায় পৌঁছাতে পারে। মানুষের আশাবাদী হওয়াই পরম লক্ষ্য। আশাবাদী না হলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, টিকে থাকতে পারে না। আমরা আশা করে আছি নতুন সরকার সব পরিস্থিতি সামলে নিয়ে একটা নতুন নির্দেশনা জাতির সামনে শিগগিরই তুলে ধরতে সক্ষম হবে। আর প্রতিটি পরিবার ও সমাজের সকল অনুষঙ্গও নতুন প্রজন্মকে তথা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়তে সহযোগিতার সকল পথ সুগম করে দেবে।

(*ডেইলি স্টার* বাংলায় ২৯ অক্টোবর ২০২৪ প্রকাশিত)

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কোটা এলিটদের দখলে কি?

সংবিধানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুযোগ দিতে বলা হয়েছে। এ কারণে চাকুরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোটাব্যবস্থা প্রচলিত। এটা জরুরি। আমি পুরোপুরি সহমত। এর বিকল্প নেই। কিন্তু রাঙামাটি, বান্দরবান, থানচি, কমলগঞ্জে চাকুরি করে আমার উপলব্ধি ভিন্নমাত্রার। দিন বদলেছে। সেদিন কি আর আছে? প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নতুন পরিসংখ্যান দরকার। তাদের গড় শিক্ষার হার, গড় আয়, শতকরা চাকুরিজীবী, শতকরা ব্যবসায়ী, ইকোনমিক গ্রোথ, সচ্ছলতার হার ইত্যাদি নতুন করে বিবেচনায় নিলে সত্যিকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেকে এগিয়ে গেছে আবার অনেকে সত্যি সত্যি পিছিয়ে পড়েছে। এখানে নতুন সমন্বয়, সংযোজন, বিয়োজন, সূক্ষ্ম সুসংহতকরণ দরকার।

তথা কেবল উপজাতি হলেই কোটার সুবিধা পাবে না, উপজাতি হতে হবে আবার পিছিয়ে পড়া অসহায়-অসচ্ছল হতে হবে। কারণ, উপজাতিদের মধ্যে অনেক অগ্রসর ধনী পরিবার আছে। কেবল নারী হলেই কোটা সুবিধা পাবে না, যে নারী পিছিয়ে পড়া বা অসহায়-অসচ্ছল সে পাবে, কারণ, নারীদের মধ্যে অনেক অগ্রসর ধনী পরিবার আছে। কেবল দরিদ্র জেলার হলেই হবে না ওই জেলার পিছিয়ে পড়া অসহায়-অসচ্ছল পরিবার হলে পাবেন। কারণ, ওই জেলাতে অনেক অগ্রসর ধনী পরিবার আছে। এভাবে প্রতিটি জাতি পেশা নৃগোষ্ঠী জেলাভিত্তিক কোটা থাকা ঠিক না।

তবে লিঙ্গ/জাতি/পেশা/নৃগোষ্ঠী বা জেলাভিত্তিক গ্রুপটির যারা অসহায়-অসচ্ছল পিছিয়ে পড়া পরিবারের, কেবল তারা কোটা সুবিধা পেতে পারে।

সংবিধানের ২৯ ধারা অনুসারে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা রাখাটা

অবশ্যই মানতে হবে। সংস্কারের বিষয়ে নিম্নলিখিত ইস্যুগুলো বিবেচনায় নেওয়া জরুরি বলে আমি মনে করি।

এক. উপজাতি কোটা অবশ্যই দরকার। তবে কাদের জন্য? সবার জন্য? ২৯টি উপজাতির মধ্যে মাত্র তিনটি উপজাতি সব কোটা সুবিধা ভোগ করছে; অন্যরা অনেক পিছিয়ে। শুধু তিনটি উপজাতিই সিংহভাগ ভোগ করবে? বাকিরা কেবল পিছিয়ে থাকবে? তা ছাড়া উপজাতিদের মধ্যে জমিদার, শত শত পাহাড় আর বাগানের মালিক, বড় বড় নেতা, আমলা, ব্যবসায়ী, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষক ও উকিল আছেন, যাঁরা সন্তানদেরকে কোটি টাকা ব্যয় করে বড় করেন, তাঁদের সন্তানেরাও কি উপজাতি কোটা পাবে? বাস্তবে এসব এলিটরাই সিংহভাগ কোটা সুবিধা ভোগ করছে, যারা কোনোভাবেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয়।

তাই কোটার নাম রাখা উচিত 'উপজাতি কেবল যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া তাঁদের জন্য কোটা'। শুধু উপজাতি হলেই কোটা পাবেন না। সংবিধানের ২৯ ধারার মর্মার্থ এটাই হওয়া উচিত।

দুই. নারী কোটা অবশ্যই দরকার। তবে কাদের জন্য? সব নারীর জন্য? নারীদের মধ্যে যারা ব্যবসায়ী, জমিদার, ঠিকাদার, বড় বড় নেতা, আমলা, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষক, উকিলসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের এলিট রয়েছে, যারা সন্তানদেরকে কোটি টাকা ব্যয় করে বড় করে, তারাও কি নারী কোটা পাবে? বাস্তবে এই এলিটরাই সিংহভাগ কোটা সুবিধা ভোগ করছে, যারা কোনোভাবেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয়।

তাই কোটার নাম রাখা উচিত 'নারী কেবল যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া তাঁদের জন্য কোটা'। শুধু নারী হলেই কোটা পাবেন না। সংবিধানের ২৯ ধারার মর্মার্থ এটাই হওয়া উচিত।

তিন. মুক্তিযোদ্ধা কোটা অবশ্যই দরকার। মুক্তিযুদ্ধ না হলে বা মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন না করলে আজকে এ বাংলাদেশ আমরা পেতাম না। তবে মুক্তিযোদ্ধা নামের সবাই কি কোটা পাবেন? ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারাও? নাকি শুধু প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা? তা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, জমিদার, বড় বড় নেতা, আমলা, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষক, উকিলসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের এলিট রয়েছে, যারা সন্তানদেরকে কোটি টাকা ব্যয় করে বড় করে, তারাও কি মুক্তিযোদ্ধা কোটা পাবে? বাস্তবে এই এলিটরাই সিংহভাগ কোটা সুবিধা ভোগ করছে, যারা কোনোভাবেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয়।

তাই কোটার নাম রাখা উচিত 'মুক্তিযোদ্ধা কেবল যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া তাঁদের জন্য কোটা'। শুধু মুক্তিযোদ্ধা হলেই কোটা পাবেন না। সংবিধানের ২৯ ধারার মর্মার্থ এটাই হওয়া উচিত।

চার. জেলা কোটা অবশ্যই দরকার। কারণ সকল জেলা সমান উন্নত নয়। তবে সংশ্লিষ্ট জেলার কারা পাবেন এ সুবিধা? সবাই? অনুন্নত জেলার নাগরিকদের মধ্যে ব্যবসায়ী, জমিদার, বড় বড় নেতা, আমলা, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষক, উকিলসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের এলিট রয়েছে, যারা সন্তানদেরকে কোটি টাকা ব্যয় করে বড় করে, তারাও কি জেলা কোটা পাবে? বাস্তবে এই এলিটরাই সিংহভাগ কোটা সুবিধা ভোগ করছে, যারা কোনোভাবেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নয়।

তাই কোটার নাম রাখা উচিত 'জেলা কেবল যারা জেলাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া তাঁদের জন্য কোটা'। শুধু পিছিয়ে পড়া জেলার নাগরিক হলেই কোটা পাবেন না। সংবিধানের ২৯ ধারার মর্মার্থ এটাই হওয়া উচিত।

সবশেষে বলব, কোটা সংস্কারে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে এবং এসব কোটার সুবিধা থেকে সংশ্লিষ্ট এলিটদেরকে বাদ দিয়ে দিলে কোটা নিয়ে যে রাজনৈতিক অর্থনীতি চলছে, তা আর থাকবে না। কোটার পরিমাণ কমিয়ে ৫-১০%-এ নিয়ে এলেও পিছিয়ে পড়ারাই এ সুবিধা পাবে।

বুয়েট-মেডিকেল-কৃষিতে পড়ে কি সাধারণ বিসিএসে আসা উচিত?

বিসিএসে বুয়েট-মেডিকেলে পড়ুয়াদের অনেকেই বিসিএস সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমসহ মিডিয়াতে বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে। বুয়েটে পড়ে প্রকৌশলী হবেন, মেডিকেলে পড়ে ডাক্তার হবেন, বিবিএ-এমবিএ করে কর্পোরেট লিডার হবেন, কৃষিতে পড়ে কৃষিবিদ হবেন, এটাই সর্বজন কাম্য এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা-ই হয়। কারণ, এর দ্বারা তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের বাস্তবমুখী ফলপ্রসূ ব্যবহার হয়। দেশের প্রকৌশল সেক্টর, চিকিৎসা খাত, কৃষি খাত, ব্যবসায় খাত লাভবান হয়, উন্নত হয়। তবে কেউ যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ছেড়ে নতুন প্রফেশনাল জগতে পা বাড়াতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া সমীচীন হবে না।

কারণ, সারা বিশ্বের সকল দেশে পাবলিক সার্ভিসের ক্যাডার-অফিসার পদে সকল স্নাতকরা আসেন। প্রতিটি দেশের নিয়োগবিধি এমনভাবেই তৈরি। এখানে দেখা হয় তার সাধারণ সব বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট লেভেলের মেধা, শ্রম, চেষ্টা আছে কি না। এ যোগ্যতায় নিয়োগ হয়। এখানে সকল স্নাতক অংশ নিতে পারেন। ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, ব্যবসায়, কারিগরি, মাদ্রাসাসহ সকল ঘরানার সকল বিষয়ের ছাত্র আসবে। সকল দেশেই এ রেওয়াজ। ক্যারিয়ার চয়েস করার ক্ষমতা প্রত্যেক নাগরিকের ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত আছে। সুতরাং যে আসে সে যোগ্যতা নিয়ে আসে এবং পরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল শিক্ষা লাভ করে।

অনেক ডাক্তারকে আইনজ্ঞ হতে দেখেছি, ইতিহাস পড়ে অর্থনীতিবিদ হতে দেখেছি, আর্টসে পড়ে নগর পরিকল্পনায় ভালো ভূমিকা রাখতে দেখেছি, সায়েন্সে পড়ে কবি হতে দেখেছি। তথা যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে

রাষ্ট্রে ভূমিকা রাখতে পারে যদি কারও ইচ্ছা থাকে। ৪ বছর ডিগ্রি নেওয়াই শেষ কথা না, চাকুরির ৩০ বছরও তার পড়েই কাটে, নেয় কঠিন প্রশিক্ষণ, লাভ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা। নাগরিক হিসেবে যে কোনো সময় তার ক্যারিয়ার সে পরিবর্তন করবে, এটা তাঁর অধিকার।

শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে কাজ করবে, ব্যবসায় পড়ে কর্পোরেটে কাজ করবে, এ রকম এক সময় আমিও ভাবতাম। সারা বিশ্ব দেখে ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্র দেখে আমার উপসংহার হলো সকল স্নাতকের অধিকার আছে বিসিএস দেওয়ার ও আসার। এ নিয়ে কোনো সমালোচনা চলে না। সারা বিশ্বের রেওয়াজ, বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত, রাষ্ট্রকাঠামো, ৩৬০ ডিগ্রি চিন্তা, হাজার উদাহরণ না জেনে কোনো সমালোচনা করা ঠিক না।

বুয়েটে পড়ে বিসিএস না দিলেই কেউ প্রকৌশলী হবে এমন ভাবনা ভুল। বুয়েটে পড়ে প্রকৌশলী হতে পারে, আমলা হতে পারে, শিক্ষক হতে পারে, কবি হতে পারে, উদ্যোক্তা হতে পারে, কর্মী হতে পারে, রাজনীতিবিদ হতে পারে, নাগরিকের যা মনে চায় তা-ই হতে পারে। আর সব হতে পারলে বিসিএস সাধারণ ক্যাডারও হতে পারবে। একজন নাগরিক মেধা দিয়ে সে বুয়েটে ঢুকেছে, মেধা দিয়ে সে বিসিএসে টিকেছে। এ নিয়ে আমরা যারা বুয়েটে পড়িনি তারা ঈর্ষা করার কিছু নেই।

সুতরাং নাগরিক হিসেবে একজন যেকোনো পেশায় যেতে পারে। যার মেধা আছে, যার ফাইট দেবার হিম্মত আছে, যার পরিশ্রম করার নেশা আছে সে গতকাল বুয়েটে পড়বে, আজকে বিসিএস ক্যাডার হবে, আগামীকাল মন্ত্রী হবে, পরশু কর্পোরেটের মাথা হবে। দুনিয়া এমন যে কেউ কাউকে জায়গা দেয় না, জায়গা করে নিতে হয়। সারা বিশ্ব পুঁজিবাদে রেখে, সমাজের সবখানে "নিজের থাকলে খাও, না থাকলে চোখ পাকাইয়া চাও" সিস্টেম বজায় রেখে শুধু বুয়েট মেডিকেলে ছাত্রদের সাধারণ বিসিএস না দিতে বলার মানে নেই। তাদেরকে আসতে দিন, অন্যরাও যুদ্ধ করুক। যুদ্ধের মাধ্যমে যোগ্যরা এগিয়ে যাক। পেছনে কথা না বলাই সমীচীন।

তবে এর ভিন্ন দিকও আছে।

অনেকে হয়তো বলবে যদি সাধারণ বিসিএসেই আসবে তবে বুয়েট-মেডিকেলে পড়ার কী দরকার ছিল। অনেক সময় এ রকম হয় যে অভিভাবকদের চাপে পড়ে ছাত্ররা একটা বিষয় নেয়, পরে ওই বিষয়ে তার আগ্রহ থাকে না। আবার এ রকমও হয় অনার্স পড়তে পড়তে ম্যাচিউরিটি আসে, জীবন ও জগৎ

সম্পর্কে ধারণা বাড়ে, কৃষি/প্রকৌশল/চিকিৎসায় পড়লেও রেজাল্ট ভালো না বা টেকনিক্যাল কাজে আর আগ্রহ ও উদ্দীপনা পায় না। কাজের প্রতি প্যাশন থাকে না। তখন তাঁদের পেশাজীবন পরিবর্তনই জরুরি। যেখানে মনপ্রাণ থাকে না সেখানে মানুষ কাজ করে সফল হয়না। সেক্টরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকে আবার সাধারণ বিসিএসের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কথা বলেন। সুযোগ-সুবিধা প্রায় সমান। বরং কারিগরি লাইনে গেলে কনসালট্যান্সি করে বাড়তি বৈধ ইনকামের অবারিত সুযোগ রয়েছে। তবে আমজনতা দীর্ঘ লিগ্যাসির কারণে সাধারণ বিসিএসের কিছু পদকে বেশি সমীহ করে। এটা সামাজিক ব্যাধি। এ থেকে পরিত্রাণ দরকার। তাই বলব যদি সাধারণ বিসিএসের পেশাগত কাজ ও এর ধরন কারও ভালো লাগে, তবেই যান। যদি কাজ ভালো না লাগে, তবে তাদের যাওয়া উচিত হবে না। শুধু কিছু নাম আর চাকচিক্য দেখে ওই পেশাতে গেলে পরে মানসিকভাবে আরাম পাবে না, আর সেবাও বিঘ্নিত হবে। টেকনিক্যাল পদগুলোতে সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রের সামর্থ্য অনুসারে বাড়ানো উচিত। এ বিষয়ে আমার একজন অভিজ্ঞ সিনিয়র বলেছেন "চাকরিতে বিদ্যমান সম্মান, মানমর্যাদা, বৈধ সুযোগ-সুবিধার কমতির কারণে যদি টেকনোক্রেটরা টেকনিক্যাল সার্ভিস পরিত্যাগ করে, তবে সেটিও দেখা দরকার এবং সমাধান দরকার।" আমি বলব টেকনোক্রেট লাইনে পড়তে যাওয়ার আগেই ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবা উচিত। ছাত্র ও অভিভাবক উভয়ের। পড়ার পরে পরিবর্তন করার চেয়ে আগে পরিবর্তন করা জরুরি। তাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা যায় এবং অর্জিত শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে দেশের জন্য লাগানো যায়।

সব মিলিয়ে আমার উপসংহার নিম্নরূপ–

প্রথমত: ব্যাকগ্রাউন্ড যা-ই হোক একজন নাগরিক যেকোনো পেশায় যেতে পারে। এটা তার অধিকার।

দ্বিতীয়ত: ছাত্র যেমনই হোক, যে বিষয় পছন্দ সে বিষয়ে পড়া উচিত। আর যে বিষয়েই পড়া হোক, যে পেশা ভালো লাগে সে পেশায় যাওয়া উচিত। যে পেশা পছন্দ না, সে পেশায় যাওয়া উচিত না। তাতে দেশের ক্ষতি, প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, নাগরিকেরা সেবা পান না।

তৃতীয়ত: অনেককে দেখেছি প্রশাসন ক্যাডারে জয়েন করে এর চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে। এত কাজ কেন? ছুটি নেই কেন? ব্যক্তিগত জীবন নেই কেন? এত প্রেশার কেন? গ্রামে পোস্টিং কেন? ইত্যাকার অভিযোগ। এগুলো যার

ভালো লাগে, তারই এ পেশায় আসা উচিত। প্রতিটি পেশার কিছু সুবিধা আছে কিছু, বিড়ম্বনা আছে। সব বিবেচনা করে পেশায় যাওয়া উচিত। শুধু হাইলাইট বা কিছু চাকচিক্য দেখে যাওয়া উচিত না। তাতে তারও কষ্ট, সেবার মানও নষ্ট। যার বিদেশ ভালো লাগে না, তার পররাষ্ট্র ক্যাডারে যাওয়া সমীচীন না। যার গ্রাম ভালো লাগে না, কাজের প্রেশার ভালো লাগে না তার প্রশাসন ক্যাডারে যাওয়া উচিত না। তেমনি ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে রয়েছে নানামুখী সুবিধা, রয়েছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। মোটকথা, যে কাজটি একজনের ভালো লাগে যে, কাজটির মাধ্যমে সেবা দিতে একজনের ভালো লাগে, তার সে পেশাতেই যাওয়া উচিত।

চতুর্থত: মেধা বা সাবজেক্ট কোনো ইস্যু না। দেশপ্রেম না থাকলে কাউকে দিয়ে দেশের লাভ হয় না। মানবপ্রেম না থাকলে কাউকে দিয়ে মানুষের লাভ হয় না। সৃষ্টিপ্রেম না থাকলে কাউকে দিয়ে সৃষ্টির লাভ হয় না। কাজপ্রেম না থাকলে কাউকে দিয়ে কাজের কাজ কিছু হয় না। দায়িত্ববোধ না থাকলে কাউকে দিয়ে দায়িত্ব পালন হয় না।

পছন্দের বিষয়ে পড়ি। পছন্দের পেশা বেছে নিই এবং পেশাতে গিয়ে পেশাকে ভালোবেসে দিনরাত কাজ করি। দেশ বিনির্মাণে ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয়ে কাজ করি।

কেন 'স্যার' ডাকবেন, কেন ডাকবেন না?

১.

চাকুরির শুরুর দিকের কথা। আমি প্রবেশনার সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট। মাদারীপুর জেলায়। এক ছুটির দিনে জেলা প্রশাসক স্যার আমাকে মোবাইলে কল দিয়েছে। আমি ফোন ধরেই সালাম দিয়েছি স্যারসহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। এরপর যত কথা বললেন ও নির্দেশনা দিলেন, তার সাথে আমিও বলে গেছি, ইয়েস স্যার, আচ্ছা স্যার, জি স্যার, স্যার ওই বিষয়টা, স্যার ওটা এভাবে, স্যার সেটা সেভাবে,...স্যার...স্যার। মানে প্রায় প্রতি বাক্যেই স্যার বলে গেছি। বাসায় নতুন বউ। সে আবার আঙুল গুনে যাচ্ছে আমি কতবার 'স্যার' বলি। সেটা আমি খেয়াল করিনি। কথা শেষ হলে বউ আমাকে বলে তুমি এ কয়েক মিনিটের কথায় প্রায় শতবার 'স্যার' বলেছ! বোঝেন অবস্থা, অপ্রস্তুত চেহারা লাল হয়ে গেল।

২.

ইংরেজি স্যার শব্দটা দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই ব্যবহৃত হয় ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্সসহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। তবে পূর্বে এটি ছিল 'Sire'। ম্যাডামও স্যারের মতো ব্যবহৃত হতো, যা Madame হতে এসেছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো এখনো এর ব্যবহার করে। স্যার, মাই লর্ড, হুজুর, ধর্মাবতার– এই সম্মানসূচক অনুষঙ্গগুলো প্রশাসনিক কাজের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল সেই ঔপনিবেশিক সময়ে, অর্থাৎ ইংরেজরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসে। তবে এসব শব্দের উদ্ভব হয় ইউরোপে সেই সামন্ত যুগে। 'স্যার' শব্দের উৎপত্তি ফরাসি দেশে, সেখানে জমিদার বা সামন্ত প্রভুদের প্রজারা সম্বোধন করত 'স্যায়ার' বলে, সেই 'স্যায়ার' শব্দটি কালক্রমে বারো শ শতকের দিকে ঢুকে পড়ে ইংরেজি ভাষায়। অনেকে বলে থাকেন যে

পৃথিবীতে সামন্ত ও ঔপনিবেশিকতার যুগ শেষ হলেও সেসব যুগের ভূতগুলো এখনো চেপে আছে আমাদের ঘাড়ে। কিছুটা প্রয়োজনে আর কিছুটা অপ্রয়োজনে।

৩.

প্রবাসে কাউকে স্যার ডাকতে হয় না, এটা অনেকেই সরলভাবে বলেন। এটা যেমন সত্য, তেমনি সবাই সবাইকে স্যার ডাকে, এটাও সত্য। বিদেশে স্যার ডাক এস্পেক্ট করে না সত্য। কিন্তু স্যার কেউ ডাকে না তা সত্য নয়। ইয়েস স্যার শব্দগুচ্ছের অনেক মানে আছে ইংরেজি ভাষায়। সম্মান করে বলে ইয়েস স্যার, কেউ ভদ্রতা করে বলে ইয়েস স্যার, কেউ ফরমালিটি মেইনটেইন করতে বলে ইয়েস স্যার। এগুলো আমরা জানি। কিন্তু এর বাইরেও স্যারের ব্যবহার আছে। কেউ কাউকে ঠেস দিতেও বলে ইয়েস স্যার, কেউ উইট করতেও বলে ইয়েস স্যার, কেউ ফান করতেও বলে ইয়েস স্যার, কেউ বন্ধুর কথায় সহমত প্রকাশেও বলে ইয়েস স্যার, কেউ কোনো কিছুতে খুশি হয়েও বলে ইয়েস স্যার, কোনো কিছু বাছাই বা পছন্দ করতে বলে ইয়েস স্যার, কেউ বিরক্ত হয়েও বলে স্যার। যেমন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন। ধাক্কা দিল কেউ এবং ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে নির্বিকার। তখন আপনি বললেন 'এক্সকিউজ মি স্যার!' এখানে স্যার ডাকা মানে সম্মান করা নয়, বরং বিরক্তি প্রকাশ করা ও মনোযোগ আকর্ষণ করা। এ রকম উপরের প্রতিটি উদাহরণ দেওয়া যাবে।

৪.

অনেকে বিষয়টার সহজ সুরাহা করেন। স্যার মানে তো জনাব। জনাব বলতে পারলে স্যার বলতে সমস্যা কোথায়? টিচারদের তো আমরা স্যার বলি, তখন কি জনাব অর্থে বলি? কিংবা সব টিচারকে কি সমান অর্থে স্যার বলি? যদিও সব টিচারকে স্যার বলি, সব সময় সকলের ক্ষেত্রে স্যার বলার মানে বা ধরন বা অভিব্যক্তি এক হয় না। কোথাও অনেক শ্রদ্ধা থাকে, কোথাও হালকা, কোথাও বলি ভয়ে, কোথাও বলি ঠেলায়। জনাব বলতে পারলে স্যার ডাকতে সমস্যা কোথায়? জনাব অর্থেই স্যার ডাকেন। জনাবই ডাকতে হবে কেন? চেয়ারকে কেদারা যে জন্য বলি না, সে জন্যই স্যারকেও জনাব বলার কোনো কারণ দেখি না।

৫.

বয়স বেশি হলেই বয়সে ছোট কাউকে স্যার বলা যাবে না। এটাও একটা থাওহা যুক্তি সরল উপসংহার। স্যারের সাথে বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই। বয়সে বড়রাও বয়সে ছোটকে স্যার ডাকতে পারেন। যদি কেউ নিজেকে বড় মনে করে বা সিনিয়র মনে করে বা হোমরাচোমরা মনে করে এবং কোনো স্যারকে স্যার ডাকতে না চান, তবে তিনি তাঁর পদের নাম নিয়ে বলতে পারেন, যেমন এএসপি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, এসি ল্যান্ড সাহেব। কোনোভাবেই ভাই, মামা, খালু ডাকার সুযোগ নেই। ভাই ভাই হয়ে গেলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে সেবা প্রদান ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব না।

প্রধানমন্ত্রীকে ভাই বা আপা ডাকা যায়, রাজনৈতিক কারণে। রাজনৈতিক সম্পর্ক আর প্রশাসনিক সম্পর্ক আলাদা। প্রশাসনিক সিস্টেমে ভাই-বন্ধু ডাকার সুযোগ নেই। বড়জোর পদের নামে সাহেব যোগ করে ডাকতে পারে। আনুষ্ঠানিক সম্বোধন।

৬.

ব্রিটিশরা স্যার শুনতে চাইত এখনো এটা বহাল আছে বিভিন্ন বাহিনীতেও প্রশাসনে। তবে আগের মতো স্যার মানে 'আমি তোমার দাস'–এ মনোভাব বা অর্থ বহাল নেই।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে এক লোক জয়েন করতে এসেছে। অফিসার প্রশ্ন করছেন, 'আপনার নাম কী?'

লোকটি বলল স্টিফেন বেটন।

এসব ঢিলে আচরণ চলবে না। এখানে অফিসারের প্রশ্নের জবাবে সব সময় স্যার বলতে হবে।

তারপর লোকটি বলল,

ইয়েস স্যার, রাইট স্যার। মাই নেইম স্যার স্টিফেন বেটন।

৭.

দুই ধরনের লোকই ঝামেলার। এক. যারা স্যার ডাক শোনার জন্য জোর করেন, তাঁরা 'স্যার অংশটুকু' ছাড়া নিজেদেরকে শূন্য মনে করেন। স্যার না ডাকলে নিজের সব শেষ হয়ে গেল বলে হায় হায় করে ওঠেন।

দুই. যাঁরা গায়ের জোরে স্যার ডাকতে চান না। তারা হয় নিজেরাই স্যার হয়ে

বসে আছেন কিংবা স্যার হতে চেয়েছিলেন জীবনের খেলায় আর স্যার হতে পারেননি। তাই কোনো স্যারকেও স্যার ডাকতে তাঁদের অনেক অনীহা ও জ্বালা।

স্যার ডাকলেই আমি ছোট হয়ে যাব, এমন ভাবনা যাদের মনে, তাঁরা নিজেরাই নিজের চিন্তায় ছোট হয়ে বসে আছেন। নিজেকে যে ছোট করে ভাবে, তাকে অন্য কেউ বড় করতে পারে না। হীনম্মন্যতায় ভুগে নিজেই আত্মহত্যা করেন প্রতিনিয়ত। উপযুক্ত স্থানে স্যারও ডাকবেন আবার নিজের অবস্থানও বজায় থাকবে, সেটা ভাবা ও এর যথোপযুক্ত মনোভাব, প্রকাশ ও অভিব্যক্তিতে রাখাও জরুরি। আবার স্থান-কাল-পাত্রভেদে স্যার না ডেকেও ফরমাল সম্বোধন এমনভাবে করতে পারেন, যাতে করে কোনো স্যার বুঝতেই না পারেন যে অবহেলা করা হচ্ছে বা অসম্মান করা হচ্ছে বা স্যার ডাকা হচ্ছে না। সেটাও বলার ভঙ্গি ও অভিব্যক্তির প্রকাশও স্থান-কাল-পাত্র বোঝার সাথে সম্পর্ক।

৮.

কর্মস্থলে অফিশিয়াল পরিবেশ রক্ষায় স্যার ডাকা বা ফরমাল সম্বোধন বজায় রাখাই সমীচীন। কিন্তু তাই বলে সারা দেশে আমাকে স্যার ডাকতে হবে, এটা আবার বাড়াবাড়ি। আমি সাবেক এক আমলাকে জানি যিনি বড় আমলা ছিলেন পরে এমপি ও মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি নিজ এলাকাতেও ভোটারদের কাছে স্যার ডাক আশা করেন। এটাও বাড়াবাড়ি। কর্মস্থলের বাইরে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের হিসেবে ডাকবেন বা কথা বলবেন। যেথায় যা প্রযোজ্য।

আবার আরেকটা মজার কেস দেখেছি। জেলা পর্যায়ে এক অফিসার জেলা প্রশাসককে স্যার ডাকবে না। তাতে তার নাকি প্রেস্টিজ চলে যাবে। কয়েক বছর পরে সে অফিসারকে দেখলাম অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সিনিয়র সহকারী সচিবকে স্যার স্যার ডেকে মুখে ফেনা তুলতেছেন। কারণ কী? কারণ হলো এখন তিনি যে প্রজেক্টের দায়িত্বে, সে প্রজেক্টের অর্থ ছাড়করণ ফাইলটি এখন সে জুনিয়র অফিসারের টেবিলে। এ রকম দ্বিমুখী আচরণ হলে তো সমস্যা। সুবিধামতো স্যার ডাকার কোনো সুযোগ নেই। ফরমাল রিলেশনে যতটুকু প্রযোজ্য, ততটুকু মেনেই স্যার ডাকা উচিত।

৯.

সমাজের সব ক্লাস বিদ্যমান। সব ক্লাস বজায় রেখে শুধু দেশের স্যারদের স্যার উঠিয়ে দিতে গেলে সেটা ধোপে টিকবে না। সামাজিক সকল ক্লাস ধীরে ধীরে

ভাঙতে হবে। তবে এটিও দিনে দিনে উঠে যাবে। উন্নত বিশ্বে স্যার ডাকতে হয় না বলে আমরা ডাকব না, এ উপসংহার অর্ধেক বোঝা উপসংহার। ওনারা স্যার না ডাকলেও সম্মান করতে বা ফরমাল রিলেশন রক্ষায় পিছপা হন না। আমাদের উপমহাদেশে ভাই ডাকতে দিলে কাঁধে হাত দিয়ে বসে থাকবে। আইনের বাস্তবায়ন আর সম্ভব হবে না। বিদেশে বাবা-মারা বাচ্চাদের ১৮-এর পরে ঘর থেকে বের দেন আমরা দেই না, বিদেশে বৃদ্ধ বয়সে বাবামাকে দেখেন না, আমরা দেখি, বিদেশে মুরব্বিদের মানা হয় না, আমরা মানি। যেসব জিনিস শৃঙ্খলা রক্ষায় চলমান আছে, তার বহাল রাখাই সমীচীন। বিদেশের কোনো কিছু আমলে নেওয়ার আগে আমাদের প্রেক্ষাপটে তা কতটা ফলপ্রসূ তা ভেবে নেওয়া জরুরি। শুধু কপি পেস্ট করলেই হবে না। সাথে বদহজমের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

১০.

"Sir ডাকব না" এ জেদটা "স্যার ডাকতে হবে" জেদের চেয়ে খারাপ। সম্মান করে কিংবা অবজেকটিভলি স্যার ডাকতে সমস্যা নেই। সিস্টেম হারমোনাইজড রাখতে স্যার ডাকের প্রচলন রাখাও দোষের নয়।

বিষয়টি খুব সহজ। স্যার ডাকা একটা সাধারণ কাজ। স্যার ডাকা বাদ দিতে হবে, এ স্লোগান হঠাৎ করে ভাবনার ফসল। পারিপার্শ্বিক সব বিবেচনায় নিলে, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় নিলে, ভাষা ও শব্দের অর্থ ও লিগ্যাসি আমলে নিলে স্যার ডাকা যথাস্থানে অবশ্যই সমীচীন।

আমি রাজা তুমি প্রজা কিংবা আমি আকাশ তুমি মাটি এ অহমিকা নিয়ে স্যার ডাকতে বলা নিন্দনীয়। কিন্তু ফরমাল রিলেশন রক্ষায় স্যার ডাকার প্রচলন রাখা স্বাভাবিক। ব্রিটিশরা স্যার ডাকটা ইউজ করে অবজেকটিভলি, সম্পর্কের দূরত্ব বোঝাতে, ফরমালিটি রক্ষায়। প্রশাসন বা বাহিনীতে সিস্টেম ফলো করা হয়। তারা আমজনতার ভাই হয়ে গেলে আইন মানানো বা প্রতিষ্ঠান রক্ষা অসম্ভব। প্রশাসনে বা বাহিনীতে নিজেদের স্বার্থে এটা করে না। বরং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তা করে। এমনকি সার্ভিসের মধ্যেও নিজেদের মধ্যে তা রক্ষা করে। আবারও বলছি, স্থান-কাল-পাত্র বিষয় পারিপারির্শ্বক বিবেচনা জরুরি। শর্টকাট উপসংহারের সুযোগ নেই।

এনজিওর স্বরূপ কেমন?

এনজিও মানে নামে বেসরকারি
কাজে সরকারি জনসেবা ক্ষেত্রের ভিন্নরূপ নাটাই।
করার কথা পরিপূরক হিসেবে শূন্যস্থান পূরণ,
করে পুনরাবৃত্তি, দ্বিগুণ ত্রিগুণ।
সরকার এনজিও চালায় না,
সরকারকে যারা চালায় তারা এনজিও চালায়।
সহজ কথায় যেসব এলিট সরকারের ডান হাত বাঁহাত
তারাই এনজিওর মেরুদণ্ড।
সরকারের হাত অনেক লম্বা,
এনজিওদের হাত আরও অনেক লম্বা।
এনজিও মানে নামে অলাভজনক,
কাজে লাভের রমরমা ব্যবসা,
পরতে পরতে সাজানো পিপাসা আর লিপ্সা।
সরকারি কাজের হিসাব প্রতিবেদনে গরমিল থাকতে পারে
এনজিও হিসাব আর প্রতিবেদনে পাক্কা। এক শতে এক শ।
হিসাবটাই পুঁজি আর সব ফাঁকা বুলি ও প্রতিবেদনের কৌশল।
এই যেমন ধরুন, একটি জেলায় স্যানিটেশন এ বছর শতকরা ত্রিশ।
তিন বছর এনজিওটি কাজ করার পর
এ হার নব্বই হলে তার সবটুকু কৃতিত্ব
এনজিও তার পকেটে নিয়ে নেয়। স্ব-উদ্যোগ,
গ্রামের ইমাম-পুরোহিতের চেষ্টা,
দানশীল ব্যক্তির উদ্যোগ, স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন
আর সরকারের মহাযজ্ঞ কোনোকিছুরই

ভূমিকা থাকে না প্রতিবেদনে। থাকলেও তা নামমাত্র কারণ
তাদের প্রতিবেদন প্রতিভা নেই, আর সরকারের থাকলেও কী!
সরকার তো করবেই। এ আর এমন কী!
এনজিও খেলা মহাখেলা। এখানেও আপনার ডানপন্থী-বামপন্থী আছে।
সাদা-নীল আছে, শিয়া-সুন্নি আছে, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টেন্ট আছে,
পূর্ব-পশ্চিম আছে, ব্রাহ্মণ-নমশূদ্র আছে।
টাকা আসে টাকা যায়, যাদের খাওয়ার আরামে খায়।
মাঝখানে ছক্কা মেরে ছোঁ মেরে ধায়।
অবাক করার বিষয় হলো,
নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন
এনজিওর নারী কর্মকর্তা শতকরা বিশ ভাগের কম।
থাকলেও তা অধস্তন পর্যায়ে।
এনজিও চালায় যারা, তারাই ভালো জানে;
এনজিওর সেবা, বিশ্বের সেরা সেবা।
কেন্দ্রে বসে প্রত্যন্ত পাহাড়ের সমস্যা জানে অনায়াসে
এসি রুমে বসে নির্ভুল প্রতিবেদন লিখে ঠেকাবে কে?
কইয়ের তেলে কৈ ভাজে, সেই ভাজা পাতে রেখে ছবি তুলে
বিশ্ব ছড়ায়, বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়, রুখবে কে?
যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।
রাজনীতিতে এনজিও আছে, আবার এনজিওতেও রাজনীতি আছে।
অর্থনীতিতে এনজিও আছে, আবার এনজিওতেও অর্থনীতি আছে।
সম-অধিকার, সমবণ্টন কাগজে লেখা আছে, কাজে নেই।
ফান্ডিং অথরিটির ইচ্ছা-অভিপ্রায়ই চূড়ান্ত কথা
কমিউনিটির প্রয়োজন, অধিকার সব কাগুজে নীতিকথা।
এনজিও সরকারের প্রশাসনিক শৃঙ্খলার কথা বলে প্যানপ্যান করে।
অথচ নিজেরই শৃঙ্খলা নেই,
চেইন অব কমান্ড নেই, সুষম বণ্টন নেই, জবাবদিহি নেই।
এনজিও অন্যের স্বচ্ছতা নিয়ে কথা বলে ফেনা তোলে
এনজিওর কাগজে স্বচ্ছতা থাকলেও কাজে ঘুটঘুটে অন্ধকার।
যত সব বায়বীয় ধোঁয়া আর বাগাড়ম্বর রচনা।
এনজিওর জবাবদিহি নিজেরা নিজেদের কাছে।

মামারটা খালুর কাছে। খালুরটা মামার কাছে।
কমিউনিটি রাজনতিবিদকে ধরতে পারে, স্থানীয় সরকারকে ধরতে পারে,
আমলাকে ধরতে পারে। এনজিওকে ধরতে পারে না।
তা ছাড়া কমিউনিটি মনে করে যা পাইছি তাই ফাউ,
প্রতিবাদ করে কী লাভ!
চুপ থাকাই ভলো, না হলে যা পেয়েছি তা-ও যাবে।
আমও যাবে ছালাও যাবে।
সরকারি নজরদারি ভাসা ভাসা না থাকার মতো
ছাই দিয়ে ধরার উপায় নেই, অনেক ফাঁকে পিছলে যায়।
যারা এনজিওর লোক। তারা নয় উজবুক।
আহরণে যত আগ্রহ বিতরণে তত না।
সাগর পেলে নদী দেয়, নদী পেলে পুকুর দেয়।
মনে রাখবেন, আহরণ করা হয় গরিবদের জন্য, কমিউনিটির জন্য।
আহরণকারী বা বিতরণকারীদের জন্য নয়।
অর্ধেকের বেশি যায়, আহরণকারী আর বিতরণকারীদের পকেটে,
তারা কিন্তু গরিব না!
বুদ্ধিজীবীরা একদিকে এনজিওর প্রশংসায় মুখে ফেনা তোলেন
আরেক দিকে এনজিওর ভাগাভাগির ধোঁয়ায় সুখটান দেন।

নোট : বাংলাদেশে এনজিও (NGO—Non-Governmental Organization) বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা সাধারণত সরকারের বাইরে থেকে কাজ করে এবং দেশের উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার, উন্নয়ন গবেষণা ও নীতি প্রণয়ন ইত্যাদিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এনজিওগুলো সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সম্পূরক হিসেবে কাজ করে এবং সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাদের এই ভূমিকা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে অনস্বীকার্য।

যেসব ইউটোপিয়ান স্লোগান নিয়ে এনজিওগুলো মাঠেঘাটে কাজ করে, বাস্তবেও প্রকৃত অর্থে সে রকম ভূমিকা রাখা উচিত। এনজিওগুলো অবশ্যই

সরকারের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। এনজিওগুলোর নিজেদের প্রতিষ্ঠানের ভেতরে আগে সুশাসন নিশ্চিত করাই সমীচীন এবং প্রাপ্ত তহবিলের সিংহভাগ যে উদ্দেশ্যে আনা হয়, সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। সেটা অর্জিত হলেই কেবল এনজিওগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে ও সমালোচনা বন্ধ হবে।

জেন্ডারবৈষম্য বলতে কিছু আছে কি? নাকি নিজেদের তৈরি?

জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ বললে বা জেন্ডার সমতা বললে অনেকে মনে করেন নারী-পুরুষ সবকিছুতেই সমান সমান পাবে। যেমন সমান কাজ করতে পারবে, সমান সম্পদ পাবে, সমান গুরুত্ব পাবে। তথা নারী যা পাবে, পুরুষ তা-ই পাবে। পুরুষ যা পাবে, নারীও তা-ই পাবে। পুরুষ যা করবে, নারীও তা-ই করবে, আবার নারী যা করবে পুরুষ করবে। যারা এমন সরলীকরণ করে ভাবে, তারা আসলে সম্যক জ্ঞান রাখে না।

জেন্ডার সমতা এমন একটি ধারণা, যা বিশ্বাস করে নারী-পুরুষ এবং এর বাইরেও যারা আছে তাদের অধিকার রয়েছে স্বাধীনভাবে বিকাশের, সক্ষমতা প্রকাশের, প্রচলিত ধ্যানধারণার সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বদ্ধমূল সনাতনি ভূমিকা থেকে বের হয়ে আসার। জেন্ডার সমতা বলতে নারী-পুরুষ, ভিন্ন আচরণ, স্বপ্ন এবং চাহিদার স্বীকৃতি ও যথার্থ মূল্যায়ন।

এর মানে এই নয় যে তাদের (নারী-পুরুষের) অবস্থা একই রকম হয়ে যাওয়া। কিন্তু তাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং সুযোগ একে অপরের উপর নির্ভর করবে না।

কখনো কখনো এমনও শোনা যায় যে নারীরা পুরুষের মতো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে, পুরুষেরা রান্নাঘরে ঢুকতে পারবে না, মেয়েরা বাইরে চাকুরি করতে পারবে না—এ রকম দাবি করা লোকজন আসলে অবাঞ্ছিত বক্তব্য দিয়ে মাঠ গরম করে।

প্রকৃত অর্থে নারী-পুরুষ উভয়ে সকল রকম অধিকার বা গুরুত্ব ভোগ করবে কোনোভাবেই কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হয়ে।

যেমন একজন নারী যদি চাকুরি বা ব্যবসা করতে চায়, তাকে সে সুযোগ

দিতে হবে। কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। আবার কোনো নারী যদি ব্যবসা বা চাকুরি না করতে চায়, তবে তাকে এ নিয়ে হেয় করে কথা বলা যাবে না। গৃহিণী বলে অবহেলা করা যাবে না। তথা কোন কাজ বা পেশা সে বেছে নেবে বা নেবে না, এটা একান্তই নারী বা পুরুষ নিজের বিষয় নিজে ঠিক করবে। সমাজ বা পার্টনার কোনো জোর খাটাবে না।

মনে রাখতে হবে, জেন্ডার সমতা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম মূল লক্ষ্য।

০২.

নারী হলে নারীর পক্ষ নিতে হবে কিংবা পুরুষ হলে পুরুষের পক্ষ নিতে হবে– এরূপ চিন্তাও পুরুষতান্ত্রিকতা।

নারীরা সাধারণত বেকার ছেলেদের বিয়ে করেননা ; তাতেই বোঝা যায় নারীরা কতটা পুরুষতান্ত্রিক।

বেকার স্বামীকে সাধারণত নারীরা স্বামীও মনে করেন না, পুরুষও মনে করেন না। এটা নারীর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। বেকার স্ত্রীকে সাধারণত পুরুষেরা স্ত্রীসুলভ মনে করেন, নারীসুলভও মনে করেন। এটা পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা।

ঘটনা ও চিত্র দুটো ভিন্ন হলেও পুরুষতান্ত্রিকতা দুজায়গাতেই বহাল তবিয়তে।

এগুলো সাধারণদের তর্ক মনে হলেও ফেমিনিস্ট ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও এ নিয়ে তর্ক লেগেই আছে। চলুন নিচের কাল্পনিক বিতর্কটি পড়ি।

ফেমিনিস্ট: আমি পিতৃতন্ত্র বলতে বুঝি যে সমাজে সবকিছুতে পুরুষদের আধিপত্য।

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ: আমি পিতৃতন্ত্র বলতে সেটা বুঝি না; আমার কাছে এর অর্থ ভিন্ন ও আরও বড়।

ফেমিনিস্ট: তাহলে তোমার ধারণাটা কী?

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ: ঠিক কীভাবে আমাদের সমাজে পুরুষ আধিপত্য বেশি?

ফেমিনিস্ট: সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিতে পুরুষেরা আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন ছেলেরা বেতন বেশি পায়।

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ: সেটা তো খুব ছোট একটি অংশের কথা বলা হচ্ছে। সমাজের বেশির ভাগ পুরুষই এর মধ্যে পড়ে না। বরং ফিশারম্যান বা জেলে যারা আছে তাদের বেশির ভাগ পুরুষ, জেলখানায় যারা আছে তারাও বেশির

ভাগ পুরুষ। যারা রাস্তায় থাকে তাদের বেশির ভাগই পুরুষ, গৃহহীনদের বেশির ভাগই পুরুষ, যুদ্ধে যায় তাদের বেশির ভাগই পুরুষ, যুদ্ধে নিহত-আহত হয় যারা তাদের বেশিরভাগই পুরুষ, সমাজের নৃশংস অপরাধের শিকার যারা হয় তাদের বেশির ভাগই পুরুষ, যারা আত্মহত্যা করে তাদের বেশির ভাগই পুরুষ, যারা স্কুলে খারাপ করে তাদের বেশির ভাগই পুরুষ, তাহলে পুরুষের আধিপত্য কোথায় পেলেন? আপনারা যা করছেন তা হলো, কিছু ঘটনা, বিচ্ছিন্ন ছোট ঘটনা তুলে আনছেন আর সব পুরুষের গায়ে লেপটে দিচ্ছেন। কিছু হাইপার সফল পুরুষের কাজকে পশ্চিমা আইডিওলজি দিয়ে চোস্ত ভাষায় স্লোগান বানিয়ে দিচ্ছেন। পুরুষবিরোধী স্লোগান। আমার কাছে এ লেপটে দেওয়াটাই পুরুষতান্ত্রিকতা, আমার কাছে কিছু পুরুষের দোষ সমস্ত পুরুষের গায়ে লেবেল সাঁটিয়ে দেওয়াটাই পুরুষতান্ত্রিকতা, আমার কাছে পুরুষতান্ত্রিকতা মানে শুধু পুরুষের আধিপত্য নয়। যেকোনো আধিপত্যই পুরুষতান্ত্রিকতার মোড়কে ঢাকা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে যারা প্রভাবশালী, তারাই অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। নারীও করে, পুরুষ করে। শুধু স্থান-কাল-পাত্র বা বিষয় ভিন্ন হয়।

০৩.

কেবল বিশেষজ্ঞরা বিতর্ক করেন, তা নয়। সাধারণদের মধ্যেও এসব তর্ক চলমান। সেগুলো শুনলে ও বিশ্লেষণ করলে জেন্ডার ইস্যু বুঝতে সুবিধা হয়। চলুন সাম্প্রতিক একটি ঘটনা কেন্দ্র করে দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে তর্কাতর্কি শুনি।

কণা: 'পুরুষ রিকশাওয়ালাকে এক নারী যাত্রী পেটাচ্ছে'—এ ভিডিওটি সকল পুরুষ দেদার শেয়ার করছে আর মহিলাকে বকাবকি করছে। ভাবখানা এমন, পুরুষেরা মনে হয় রিকশাওয়ালার গায়ে হাত তোলে না। বাস্তবতা হলো প্রতিদিনই রিকশাওয়ালারা মাইর খায়। তবে সেসব ক্ষেত্রে যিনি মারছেন, তিনি পুরুষ। তাই পুরুষেরা শেয়ার করেন না। এ ঘটনাটিতে একজন নারী পুরুষকে পিটিয়েছে, বলে শেয়ার করছেন।

শুভ: আমি তো এতে দোষের কিছু দেখছি না। প্রথম কথা হলো এ ভিডিওটি যিনি করেছেন, হতে পারে তিনি পুরুষ। তিনি শেয়ার করেছেন, অন্য পুরুষেরাও শেয়ার দিচ্ছেন। একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েই শেয়ার করছেন। যখন পুরুষেরা রিকশাওয়ালাকে মারে তখন নারীরা ভিডিও করলেই পারে, শেয়ার করলেও পারে। তাঁরা করে না কেন? মহিলাদের অনেকে হয়তো

মনে করেন যে পুরুষেরা রিকশাওয়ালাকে মারলে সেটা অন্যায় না। দ্বিতীয়ত, যে মহিলা রিকশাওয়ালাকে মেরেছেন, তাঁর এ মারাও তো পুরুষতান্ত্রিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। তথা যার ক্ষমতা বেশি সে অন্যকে মারবে। যে মহিলা নিজে পুরুষতান্ত্রিকতায় আক্রান্ত, তার পক্ষ নেবার কী আছে?

কণা: আমি পক্ষ নিচ্ছি না। পুরুষেরা যখন পেটায়, সেই ভিডিও তো পুরুষেরা এমন করে শেয়ার করে না! তা ছাড়া আমার মনে হয় মহিলার তাড়া ছিল, জরুরি কোনো কাজ ছিল, আস্তে চালাচ্ছে দেখে মহিলা রেগে গিয়েছিল। রেগে গিয়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে আচরণ করেছে। এখানে জেন্ডার-ফেন্ডার টানা ঠিক না। অথচ পুরুষেরা গণহারে শেয়ার দিয়ে নারীটিকে হেয় করছে।

শুভ: মানুষ রেগে গেলেও সব সময় এ রকম আচরণ করে না। যখন সে বুঝে পরিস্থিতি তার অনুকূলে বা ক্ষমতায় বা ক্লাসে সে উপরে তখনই সে রাগ দেখায় ও অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কণা: তাই নাকি? আসলে নারীরা সবসময়ই ভিকটিম। এখানেও মহিলাটি ভিকটিম হলো। যে কাজ অনেকেই করে; কারও ভিডিও ট্রল হয় না, শুধু সে নারী বলে তার ভিডিও দেশব্যাপী আলোড়ন তুলেছে। এটি নারী ও তার পরিবারের উপর নির্যাতন।

শুভ: বাহ্! মার খেলো পুরুষ। নির্যাতিত হলো পুরুষ, আর আপনি নারী নির্যাতন খুঁজে পাচ্ছেন? ফেনীর সাবেক এমপি হাজারী কিংবা রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ খান যে বলেছিলেন "পুরুষ নির্যাতন আইন চাই", সেটাই দেখছি বাস্তব এখন। আর আপনি নারী ও তার পরিবার নির্যাতিত বলছেন কেন? এ ট্রলের কারণে নারীটি এখন দেশের সবার পরিচিত। কে বলতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের আগামী এমপি ইলেকশনে নমিনেশন পেয়ে যেতে পারে। এমন মারদাঙ্গা যোগ্য নারী কোথায় পাবে ট্রাম্পের দল। তাঁকেই তো খুঁজছে সমগ্র বিশ্ব। কোথায় নারীরা খুশি হবে, তা না, আবারও পুরুষদের পেছনে লেগেছে।

কণা: শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে মানসিক নির্যাতন অনেক বেশি দগদগে, কষ্টকর। এ নারীটি এ ঝামেলার উপর দিয়ে যাচ্ছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এ চিত্রটি বড়ই ভয়াবহ। ঘরে কিংবা বাইরে, দেশে কিংবা বিদেশে পদে পদে নারীকে হেয় করা, নিগৃহীত করাই পুরুষদের কাজ। এটা করতে না পারলে পুরুষদের পেটের ভাত হজম হয় না।

শুভ: তাই? আচ্ছা আজ যদি রিকশাওয়ালা ছেলেটি পাল্টা নারীটির চুল ধরে

টেনে মাটিতে ফেলে দিত, তাহলেও কি ভিডিও শেয়ার কম হতো? তখন তো নারী-পুরুষ সবাই ফেসবুকে শেয়ার করত আর নারী নির্যাতনের মামলার জন্য আন্দোলন হতো। ছেলেটি জেলে যেত। মোটকথা হচ্ছে ক্ষমতার লড়াই মূল কথা। এখানে নারী-পুরুষ বিষয় না। মানুষ হিসেবে কোনো মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ? না। যখনই ক্ষমতা ও শ্রেণির ব্যবধান, তখনই আমাদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ইগো।

কণা: আপনি এত প্যাচাচ্ছেন কেন? আপনি কি ওই সময় ওখানে ছিলেন? মহিলার সাথে রিকশাওয়ালার কী কথা হয়েছে আপনি জানেন? কোন কথার কারণে কী পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা মেজাজ হারিয়েছে, সেটা না জেনে মন্তব্য না করাই ভালো।

শুভ: আমিও তা-ই বলি। আমি জানি না। আপনিও জানেন না। না জেনেই আমরা সবাই মন্তব্য করছি, শেয়ার করছি। আপনি মন্তব্য করলেন, তাই আমিও করলাম। আসলে ফেসবুকে শেয়ারকারীদের চেয়ে আমি-আপনিও কম দায়ী না। ঘটনাস্থলে না থেকে না জেনে ইনিয়ে-বিনিয়ে নিজের জানা জগৎ থেকে উপসংহার টানছি আর সিদ্ধান্ত দিচ্ছি।

কণা: ভিডিওতে দেখলাম একজন বলছে, "আপনি মহিলা মানুষ হয়ে এ রকম আচরণ কেন করছেন?" মানে হলো পুরুষ হলে এ আচরণ যথাযথ ছিল! যত সব পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা।

শুভ: যে পুরুষটি বলছেন তিনি হয়তো পুরুষতান্ত্রিক। তবে এর অন্য দিকও ভাবা যেতে পারে। পুরুষেরা সব সময় খারাপ আচরণ করে এবং এ ধরনের আচরণ নারীরা করা মানে হলো সে পুরুষের মতোই খারাপ। মানে সেই মারমুখী নারীটিও পুরুষতান্ত্রিকতায় আক্রান্ত। সেই বোধ থেকে বলা। তাতে যে পুরুষ এমনটা বলেছিলেন, তিনি পুরুষদেরই খারাপ বলার চেষ্টা করেছেন। তথা নারীরা ভালো, কোমল, মায়ের মতো, বোনের মতো, মারমুখী না, বদমেজাজি না, ধৈযশীল যাবতীয় ভালো গুণ নারীদের। ওই পুরুষ হয়তো এটা ভেবেই বলেছেন আসলে প্রতিটি কথাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে চিন্তা করা যায়।

কণা: যা-ই বলেন, মহিলা না হয় একটু ভুল করেছেন। কিন্তু যারা শেয়ার করছেন আর গালাগালি করছেন, তারাও অন্যায় করছেন। এটা মোটেই সমীচীন নয়। এটা স্পষ্ট নারী নির্যাতন। নারীটির উপর ও তার পরিবারের উপর নির্যাতন।

শুভ: হুম তা বটে। আমি সহমত। তবে এখানে যদি মেয়েটি নির্যাতিত

হতো, তাহলে এতক্ষণে মানবাধিকারকর্মী বা উকিলরা মামলা করে ফেলত। হাইকোর্ট দেখিয়ে ছেড়ে দিত। পুরুষগুলো বেকুব তো, শুধু ফেসবুকে শেয়ার আর গালি দিয়েই খালাস। মামলা করতে এখনো কেউ এগিয়ে আসেনি। পুরুষেরা শুধু ফেসবুক চেনে, হাইকোর্ট চেনে না।

যাই হোক, আমার মনে হয় এখানে জেন্ডার ইস্যু নেই, এখানে ক্লাস স্ট্রাগল বা শ্রেণিসংগ্রাম আছে।

কণা: নারীটি যা করেছে, তাতে ক্লাস স্ট্রাগল থাকতে পারে, কিন্তু পুরুষেরা ফেসবুকে পত্রিকায় যা করছে, সেটা জেন্ডার ইস্যু। কিছু লোক দেখলাম বলতেছে মহিলাটি বিএনপি কর্মী, কিছু বলছে আওয়ামী লীগ কর্মী। এ নিয়ে দুদলের লোক দুদলকে টেনে এনে দলের দোষ দেখছে। ফেসবুক বড় তামাশার জায়গা। এত এডিটিং হয়! রাজনীতি আমাদের পিছু ছাড়ে না। রাজনৈতিক আবরণ দেয়া লাগবেই।

শুভ: আসলে সে যে পার্টিরই হোক, আচরণ একই হবে। ক্ষমতায় থাকলে মানুষের চেহারা পাল্টে যায়। যে ব্যবহার করেছে, মানুষ হিসেবেই করেছে। মানুষ হিসেবে আমাদের উচিত শ্রেণীবৈষম্য, জেন্ডারবৈষম্য, রং বৈষম্য ইত্যাদির উর্দ্ধে ওঠা। নারী বা পুরুষ হবার আগে আমাদের মানুষ হওয়া জরুরি।

৪.

কর্পোরেট জগৎ নারীদেরকে পণ্য বানিয়ে দিচ্ছে। নারীরা সেই ফাঁদে পা দিচ্ছে। উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি ও পোশাক পরতে হয়, যা খুবই কষ্টদায়ক। শারীরিক ও মানসিকভাবে পীড়াদায়ক। তবু মেয়েরা এসবই করে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি নিজের চেহারা ও চামড়াতে এমন এমন পণ্য ব্যবহার করে যা সত্যিকার অর্থে সৌন্দর্যও বাড়ায় না, স্বাস্থ্যকরও না। বরং দীর্ঘ মেয়াদে অনেক ক্ষতি করে। প্লাস্টিক সার্জারি নামে আরেক প্রযুক্তি এসেছে। মানুষের মুখ পুড়ে গেলে বা দুর্ঘটনায় রূপান্তর হলে হয়তো এর সত্যিকার ব্যবহার করা জরুরি। কিন্তু অন্য যারা কেবল চেহারা পরিবর্তন ও স্কিন টোনের জন্য করেন, তাঁরা আসলে নিজের ক্ষতি নিজেই করেন। বিজ্ঞান আমাদের ক্রমাগত লোভী ও অপরিণামদর্শী করে তুলেছে।

সৌন্দর্যবর্ধন একটি প্রয়োজনীয় কাজ। নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনও জরুরি। তাই বলে বিউটি পার্লারে যেতেই হবে আর মাত্রাতিরিক্ত প্রলেপ দিতেই হবে, তা কাম্য নয়। প্রাকৃতিক যা আছে তা-ই ভালো। ভ্রুসহই

নারী সুন্দর। ভ্রু একটা একটা করে তুলে এত কষ্ট করার কোনো কারণ নেই। চুল যে কালারে আছে তা-ই সুন্দর। ভিন্ন কালারের কী দরকার? যাঁরা পর্দায় কাজ করেন তাঁরা নানা চরিত্রের কারণে এ রকম করতে পারেন। সাধারণ মানুষের এসব কী দরকার? সাধারণভাবে রূপচর্চা ও যতটা ভালোভাবে নিজেকে রাখা যায়, সেটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু এমন যেন না হয় যে লোকে আপনাকে চিনতে পারছে না।

এক মধ্যবয়স্ক নারীর হার্ট সার্জারির চলাকালে সে আবছা দেখতে পেল যে গড তার সামনে হাজির। মহিলা প্রশ্ন করল, 'আমি কি বাঁচব?' ঈশ্বর বলল 'না, তুমি মরবে না, আরও ত্রিশ বছর বাঁচবে।'

ত্রিশ বছর বাঁচবে শুনে মহিলা হার্ট সার্জারির পরপরই সুস্থ হয়ে শরীরের বিভিন্ন ইমপ্ল্যান্ট করল, বডির শেপ পাল্টাল, মাথায় চুল স্থাপন করল, ঠোঁটে ইনজেকশন দিয়ে কামনাময়ী হলো, চোখে লেন্স পরল, বলিরেখা ডিলিট করল, মুখের আদল পরিবর্তনের জন্য ও আরও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য বিউটি পার্লারে যা যা করা যায় সব করল।

তাকে সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তরুণী দেখাচ্ছিল। বিউটি পার্লার থেকে ফেরার পথে রাস্তা ক্রস করার সময় গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মহিলা মারা গেল।

পরকালে ঈশ্বরের সাথে দেখা। মহিলা কোনো দেরি না করেই প্রথমে প্রশ্ন করল, তুমি না বলেছিলে আমি আরও ত্রিশ বছর বাঁচব। রাইট? তা তো সত্য। বললেন ঈশ্বর।

তাহলে আমি এখন মারা গেলাম কেন? মহিলার অবাক করা প্রশ্ন।

ঈশ্বর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি।

৫.

গত বছর 'গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না' স্লোগানের পক্ষে থাকবেন, নাকি বিপক্ষে থাকবেন এ দুভাগে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে জাতিকে। বিএনপি-আওয়ামীলীগের মতো বিভাজন। কিংবা ইসলামী, নন ইসলামী বিভাজন বিশ্বের সবখানে যে রকম হয়।

অথচ দুদিকে কিংবা মাঝখানে বা এর বাইরেও থাকা যায়!

ক. যিনি 'গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না' বলেছেন, তিনি তো ইচ্ছে করে গা ঘেঁষে দাঁড়াতে না করেছেন। অনিচ্ছাকৃত বা প্রয়োজনীয় ভিড়ের চলার পথে লেগে

যাওয়াকে মিন করেননি। এটা স্পষ্ট। তবু যারা এর মধ্যে বাসের ধাক্কাধাক্কি বা ভিড়ের ঘেঁষাঘেঁষিকে টেনে আনছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে 'লেগে যাওয়া আর লাগানো এক নয়'; ঘেঁষ খাওয়া আর ঘেঁষ দেওয়া এক নয়; 'ধাক্কা খেয়ে ফেলা আর ধাক্কা দেওয়া এক নয়'; 'ছোঁয়া লেগে যাওয়া, আর ছোঁয়া বা ধরা এক নয়'। একটি অনিচ্ছাকৃত, আরেকটি ইচ্ছাকৃত। কোনটা অনিচ্ছাকৃত আর ইচ্ছাকৃত, সেটা বোঝার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষের আছে। নারীদের একটু বেশিই আছে।

নারীরা এটা টের পায়, বুঝতে পারে। যখন কোনো নারী এটা দাবি করে, তখন নিশ্চয়ই সে ভিকটিম হয়েছে বলেই দাবি করে।

খ. যারা মনে করেন ভুলেও লাগা যাবে না, ভুলেও ছোঁয়া হবে না, ভুলেও ঘেঁষা যাবে না, ভুলেও ঠেলায় স্পর্শ করা যাবে না তারা নরকে বসে স্বর্গের আরাম চাচ্ছেন, যা হবার নয়। অযৌক্তিক। বাসের ভিড়ে কিংবা ঈদের মার্কেটের ভিড়ে, অন্যমনস্কতায় কিংবা ভিড়ের চাপে, বেখেয়ালে কিংবা আমজনতার ধাক্কায় কারও সাথে কারও ঘেঁষা লেগে যেতে পারে। প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে লাগা বা অনিচ্ছাকৃত লাগাকে ঘেঁষা বলার কোন মানে হয় না; কুয়াশাকে আগুনের ধোঁয়া বা আগুন বলার কোনো মানে হয় না।

আমার নিজের অভিজ্ঞতাও এ রকমই। সামাজিক কারণেই নারী-পুরুষের ধাক্কাধাক্কি এড়িয়ে চলি কিংবা সামাজিক অনুশাসনে বড় হওয়ায় মানসিক গঠন এমন হয়েছে যে বিপরীত লিঙ্গের কেউ এসে লেগে গেলে অস্বস্তি ফিল করি বা বিব্রত বোধ করি।

কিন্তু আজকাল শপিং সেন্টারে খেয়াল করলাম, ধাক্কা শুধু খেয়ে যাচ্ছি, অস্বস্তি বা বিব্রত বোধ করেই যাচ্ছি কিন্তু যারা ধাক্কা দিচ্ছে তাদের কোনো বিকার নেই। একেবারে কিচ্ছু হয়নি ভাবে হনহন করে চলছে। সবকিছু পানিভাত হয়ে গেছে।

এতে প্রমাণ হয় যে বাংলাদেশে নারীরা আরও সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে পথেঘাটে চলতে শুরু করেছে। এটা একটা ইতিবাচক দিক।

মানে আমি এর ইতিবাচক দিকটাই ভাবছি আরকি।

সুতরাং অসতর্ক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে লেগে যাওয়াটা অন্যায় নয়।

ছোটবেলায় শোনা গল্প। হুবহু মনে নেই। যা মনে আছে তা-ই বলছি।

এক গ্রামে এক লোক বাস করত। তার সবকিছুই ভালো, সব সময়ই

ভালো। শুধু 'মন' শব্দটা শুনলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে খ্যাপাটে পাগলা হয়ে যায়। হাতে দা নিয়ে দিগ্‌বিদিক ছুটতে থাকে, যারে পায় তারে কোপায়। পাড়ার সবাই মিলে কৌশলে জাপটে ধরে মাথায় পানি ঢাললে পরে তবে শান্ত হয়। আবার সব ভুলে যায়। সবকিছু ঠিকমতো চলে। পাড়া শান্ত থাকে, পাখি গায়, বাতাস বয়। বাচ্চারা মক্তবে যায়, রাখাল মাঠে যায়, মুরব্বিরা মেলমজলিশ নিয়ে থাকে।

হঠাৎ কেউ কোনো কথার ফাঁকে যদি 'মন' শব্দ বলে আর সেখানে যদি সেই লোক হাজির থাকে, তবেই সব সারা। যেমন পাড়ার কেউ কাউকে মুড অফ করে বসে থাকতে দেখে বললো 'কী ব্যাপার মিয়া? কেমন আছো?' উত্তরে মন খারাপ করা ব্যক্তি বললো, 'আর বোলোনা মনটা ভালো নেই।' ওখানে সেই লোক যদি 'মন' শব্দ শুনে ফেলে আবার শুরু হয় তার দিগ্‌বিদিক দিক ছোটা, দা নিয়ে কোপানো, পুরো পাড়া মাতিয়ে তোলা। আতঙ্কে কাঁপে নতুন বধূরা আর শিশুরা। আবার জাপটে ধরো, পানি মাথায় ঢালো, মাথা ঠান্ডা করো। এ এক তামাশা আর কী!

'গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না' স্লোগানও কি আবার আলুর দোষদের মনে করিয়ে দেবে? এ প্রশ্ন আসতেই পারে।

তালাকে সামাজিক সংকট, কে দায়ী? নারী না পুরুষ

একটি সমাজে বিয়ে যত আনন্দ নিয়ে হয়, সংসারে তার লেশামাত্র থাকছে না। ফলে বিবাহবিচ্ছেদ এখন সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা দেশে। আর বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সমাধানে দেখছি না যথাযথ উদ্যোগে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বিশ্বায়ন মানুষের সকল আচার ও বিশ্বাসে পরিবর্তন এনেছে। পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও লিগ্যাসি ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ধারণা, প্রবণতা, অনুশীলন ইত্যাদিতে এসেছে নতুন সংবেদনশীলতা। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহবিচ্ছেদ বেড়েছে। তালাকের ইতিহাস প্রাচীন হলেও ১৮৬৯ সালের ডিভোর্স আইনের মাধ্যমে আইনানুগ তালাকের কার্যক্রম শুরু হয় ভারত বা বাংলার এ অঞ্চলে।

বর্তমানে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ অনুসারে তালাকের কার্যক্রম চলে মুসলমানদের জন্য। আর হিন্দুদের ক্ষেত্রে তালাকের নিয়ম নেই। তবু কেউ সংসার করতে না চাইলে বা ডিভোর্স দিতে চাইলে হিন্দু ম্যারিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৫ বা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আদালতের মাধ্যমে ডিভোর্স কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। আইনানুগ নিয়মকানুন ছাড়াও সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা অনুসারে প্রকাশ্যে বা গোপনে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে এবং নানাবিধ কারণে বিচ্ছেদ নামক সামাজিক ব্যধির প্রকোপ লক্ষ করা যাচ্ছে কুমিল্লা সিটিসহ সারা দেশেই। ঘটা করে বিশাল আয়োজনে যে বিয়ে হয় কিংবা উত্তাল প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে যে বন্ধন হয়, সে বন্ধনে কেন ফাটল ধরে? "একটি আংটি, একটি স্বাক্ষর, একটি এনভেলাপ, বয়ে আনে সংযোগ; ক্রোধাগ্নিতে পুড়ে গেলে সেখানে বয়ে আনে বিচ্ছেদ'।'

আর তালাকের ক্ষেত্রে একজন নাগরিককে তালাকের কপি নগরীর মেয়রের নিকট বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে প্রেরণ করতে হয়। ৯০ দিনের

মধ্যে পক্ষদ্বয় নিজেরা কিংবা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সালিসে তালাকনামা ফিরিয়ে নিতে পারে। আইনানুসারে ৯০ দিন পার হলে সালিস হোক বা না হোক, অন্য পক্ষ মানুক বা না মানুক, মিলমিশ না হলে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

কেস স্টাডি হিসেবে ঢাকার বাইরে কুমিল্লা নিয়ে একটা পরিসংখ্যান দেওয়া যায়। এই সিটির নগর ভবনের সাধারণ শাখায় তালাকনামার নোটিশ রেজিস্টারে দেখা যায় যে প্রতিদিনই একাধিক তালাক নোটিশের কপি আসে। যেমন ২০১৬ সালে ২৬৫টি, ২০১৭ সালে ৩১১টি, ২০১৮ সালে ২২১টি, ২০১৯ সালে ২৯৬টি, ২০২০ সালে ১৮৭টি, ২০২১ সালে ৩০১টি এবং ২০২২ সালে ২০২টি তালাকের নোটিশ পাওয়া যায় (সূত্র : কুসিক ওয়েবসাইট)। তার মানে এই নয় যে এগুলোই নগরীর মোট তালাকসংখ্যা। বরং কমসংখ্যকই নোটিশ আকারে নগর ভবনে আসে। অনেক তালাক বা ছাড়াছাড়ি নোটিশ ছাড়াও হচ্ছে। তাই বলা যায় যে গড়ে প্রতি বছরে ৫০০'-এর অধিক তালাকের ঘটনা কুমিল্লা নগরীতে ঘটে। আমরা যদি অন্য সিটির দিকে নজর দিই, দেখি যে দুই ঢাকা সিটিতে গড়ে বছরে প্রায় ১০ হাজার তালাক হয়, যেখানে মোট ভোটার সাড়ে ৫৪ লাখ (*প্রথম আলো*)। চট্টগ্রাম সিটিতে বছরে গড়ে ৪ হাজার তালাকের ঘটনা ঘটে, যেখানে সিটির মোট ভোটারসংখ্যা প্রায় ২০ লাখ (*যুগান্তর*)। সে তুলনায় ২ লাখ ৩০ হাজার ভোটারের কুমিল্লা নগরীতে বছরে প্রায় ৫০০ তালাকের ঘটনা উদ্বেগজনক বলেই সচেতন নাগরিকগণ মনে করেন।

প্রাসঙ্গিকতা ও জনগুরুত্ব বিবেচনা করে তালাক বৃদ্ধির কারণ ও প্রবণতা নিয়ে জনমত বুঝতে একটি অনানুষ্ঠানিক জরিপ করা হয়। অনলাইনে ও অফলাইনে (কুমিল্লায় পরিচালিত) জরিপে ৬০৩ জন অংশগ্রহণ করে। উত্তরদাতারা সমাজের বিভিন্ন অংশের, বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পেশার নারী ও পুরুষগণ। একটি প্রশ্নে তালাকের বিভিন্ন কারণ তালিকা করে দেওয়া হয়। তা থেকে উত্তরদাতারা বিভিন্ন কারণ টিক চিহ্ন দিয়ে নির্বাচিত করে। আবার উন্মুক্ত প্রশ্নাংশে উত্তরদাতারা নিজেও কিছু কারণ উল্লেখ করে। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বিচ্ছেদের জন্য প্রায় ৩৩টি কারণকে চিহ্নিত করে উত্তরদাতারা। কারণগুলোকে কোয়ালিটেটিভ থিমে বিবেচনা করলে ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত: ব্যক্তিগত আচরণ ও চারিত্রিক সমস্যাই প্রধান কারণ বলে দেখা যাচ্ছে। ষড়রিপুতে আক্রান্ত মানুষ পরকীয়াতে জড়ায়, প্রতারণা করে, গোপনে

নানা রকম সম্পর্কে জড়ায়। আবার স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষ সীমানা মানে না, তখন পারস্পরিক সম্মানবোধের অভাব দৃষ্টিকটুভাবে ধরা পড়ে। সুশিক্ষা ও মাত্রাজ্ঞানের অভাবে মানুষ কেবল নিজের অধিকার যতটা বুঝে পেতে চায়, দায়িত্ব পালনের বেলায় ততটা আন্তরিক হয় না।

দ্বিতীয়ত: শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতাও বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ী। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনোভাবে সাইকোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারে ভোগে। সেটা যখন মাত্রা ছাড়ায় তখনই সেটা মানসিক রোগ হিসেবে দাম্পত্য জীবনে প্রভাব ফেলে। সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা দাম্পত্যকে কুঁরে কুঁরে খায়। স্পাউস যখন শারীরিকভাবে সংসারের কাজে অক্ষম বা অসুস্থ, তখনো দাম্পত্যে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, শারীরিক অসুস্থতায় স্পাউসকে প্রেম দিয়ে দিনের পর দিন আগলে রাখবে–এমনটা সব সময় ঘটে না। দাম্পত্য বিচ্ছেদের আরেকটি বড় কারণ হলো পুরুষত্বহীনতা ও নারীর মিলনে অনীহা। সন্তান না হওয়াটাকে অনেক স্বামী বা স্ত্রী মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে অনেক পুরুষ ও তার পরিবারের সদস্যরা এটাকে কোনোভাবেই মানতে চায় না।

তৃতীয়ত: বিশ্বায়ন, আধুনিকতা ও আইসিটির প্রভাব মানুষের মনোজগৎ বদলে দিয়েছে। সারা দিন অনলাইনে, সোশ্যাল মিডিয়াতে, কেবল টিভিতে, ইউটিউবে, টিকটকে, মুভি সাইট ও সিরিয়ালে মজে থাকে। রীতিমতো নেশা, যা অন্য যেকোনো খারাপ নেশা থেকে কম ক্ষতিকর নয়।

চতুর্থত: পারিবরিক সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। ধর্মীয় রীতি মানে না, সামাজিক আচার ও প্রথা মানে না। এর ফলে মানুষের মধ্যে বন্ধন কমে যাচ্ছে, নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে।

পঞ্চম: নারীর ক্ষমতায়নকে অনেকে দায়ী করে। যদিও এটি ইতিবাচক তবু অনেক স্বামী বা স্বামীর সমাজ তা মানতে পারে না। নারীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত বৃদ্ধির ফলে ক্ষমতায়নের যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়, তেমনি অবাধ্য হওয়া, সহানুভূতির অভাব, কর্মসংস্থানে ব্যস্ত থাকা, পরিবারকে সময় কম দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। স্পাউস দূরে বা বিদেশে থাকাও বিচ্ছেদের একটা বড় কারণ হিসেবে ধরা হয়।

ষষ্ঠ: সুশাসন ও ন্যায়বিচারের অভাব সমাজে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটায় এবং সমাজে তা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন মাদকাসক্তি, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, ভরণপোষণ না দেওয়া, যৌতুক চাওয়া, নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ। এসব ফৌজদারি অপরাধ ক্রমাগত বাড়ছে।

বনিবনা না হওয়া পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য যদিও সাধারণ কারণ, তবু পুরুষ ও নারীর তালাক প্রদানের কিছু ভিন্নতর কারণ রয়েছে। নারীরা তালাকের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে স্বামীর সন্দেহজনক আচরণ, পরকীয়া, যৌতুক, বিদেশে গিয়ে না ফেরা, মাদকাসক্তি, পুরুষত্বহীনতা ও ব্যক্তিত্ব সংকট। আর পুরুষেরা তালাকের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে ধর্মীয় জীবনাচরণ না মানা, বদমেজাজ, উদাসীনতা ও স্বামী বিদেশে থাকার ফলে স্ত্রীর অন্যের সাথে সম্পর্কে জড়ানো। পুরুষের তুলনায় নারী কর্তৃক তালাকের সংখ্যা তুলনামূলক বেড়েছে। নারীদের পেশাগত, আর্থিক ও শিক্ষাগত ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নারীদের যেমন আচরণে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি পুরুষেরাও সহজে মেনে নিতে পারে না নারীদের এসব পরিবর্তনকে। ফলে শুরু হয় দাম্পত্য কলহ।

তালাকের শতাধিক নোটিশ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে বেশির ভাগই তালাকের কারণ উল্লেখ না করে লিখেছে, 'বিবাহের শর্তাদি না মানায় নিকাহনামার...ক্ষমতাবলে তালাক দিলাম।' আর যারা কারণ উল্লেখ করেছে, তারা প্রকৃত কারণ না লিখে গড়পড়তা কিছু কথা লিখেছে। যেমন বনিবনা না হওয়া, মিলমিশ না হওয়া, মারামারি বা নির্যাতন ইত্যাদি। কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে প্রকৃত কারণটা তারা পাবলিকলি বলতে চান না বা জানাতে চায় না। তাই তালাক কার্যকর হবে, এমন কিছু একটা লিখে দেন।

সমাজে যদিও তালাকের সংখ্যা বেশি, তবু সমাজ এখনো তালাককে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। তালাকপ্রাপ্ত নারী বা পুরুষকে সমাজ নানাভাবে নিগ্রহ করে, অপবাদ দেয়, দোষারোপ করে। বিশেষ করে নারীদেরকে লজ্জা ও অপমানকর কথা বলে। সিঙ্গেল মাদার বা সিঙ্গেল ফাদারকে এখনো সমাজ সেভাবে সহজে গ্রহণ করে না। যদিও সমাজে এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিচ্ছেদের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সন্তানেরা। একটা আশঙ্কাজনক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষাব্যবস্থা।

উপরিউক্ত কারণগুলো বিবেচনায় সুশিক্ষা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধিই পারে বিবাহবিচ্ছেদ ঠেকাতে। রাষ্ট্রীয় আইন মানা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মানলেও বিচ্ছেদ কমবে, কারণ, তাতে মানুষ অন্যায়, অপরাধ, নেশাতে জড়াবে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচরণে কেবল কর্ম আর ব্যস্ততা না রেখে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে হবে। তাই সত্যিকার ভারসাম্যমূলক জীবনাচরণ দরকার।

আরেকটি বাস্তবতা পাওয়া গেল অনেক ভুক্তভোগীর জবানে। তালাক

দেওয়ার কয়েক মাস পর দম্পতির মনে হয় যে তালাক দেওয়া ঠিক হয়নি। আরেকটু মানিয়ে নিলেই হতো। এইভাবে সিঙ্গেল লাইফে পরিবার, প্রতিবেশী ও স্বজন থেকে যে বিরূপ আচরণ বা কমেন্ট পায়, তা থেকে দাম্পত্যে থাকা অবস্থার জটিলতাগুলো মামুলি বিষয় ছিল। কিংবা দ্বিতীয় বিয়ের পরে মুখোমুখি হয় আরও নানান সমস্যা, যা থেকে প্রথম দাম্পত্যের সমস্যাগুলো ছোট সমস্যা ছিল। কিন্তু তত দিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আর ফেরার উপায় থাকে না। তাই নতুন নতুন জটিলতর কঠিন সমস্যা নিয়েই বাস করতে হয়। তাই তালাকের আগে চিন্তা করা উচিত। ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

*